অর্থনীতি

নবম ও দশম শ্রেণি

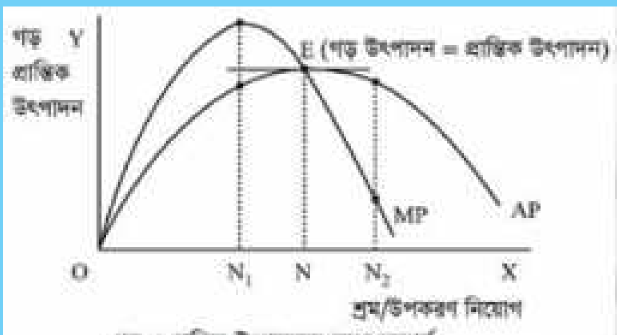

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক

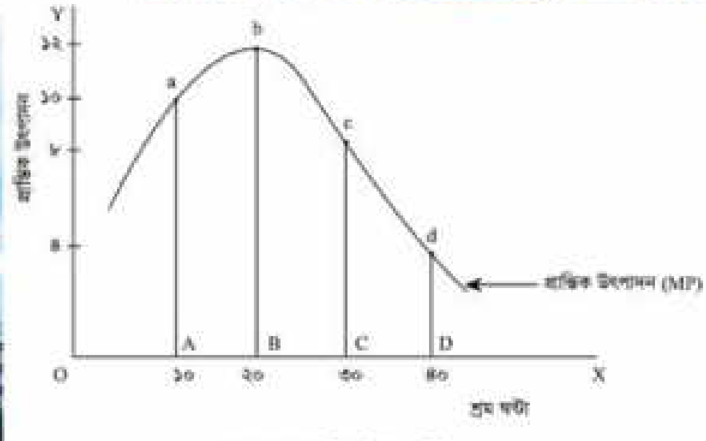

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

অর্থনীতি

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর মুহম্মদ ইসমাইল হোসেন

প্রফেসর মোঃ আমির হোসেন

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার

ড. মোঃ আজম খান

মোহাম্মদ ফখরুল আলম

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের স্বরূপ-প্রকৃতি অবহিত হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে নবম-দশম শ্রেণির **অর্থনীতি** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে আধুনিক অর্থনীতির পরিচয় ও গুরুত্ব থেকে শুরু করে উপযোগ, চাহিদা, উৎপাদন, বাজার ও ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারের অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রায় সকল উপাদান সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	অর্থনীতি পরিচয়	১-১৪
দ্বিতীয়	অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ	১৫-২৮
তৃতীয়	উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য	২৯-৪২
চতুর্থ	উৎপাদন ও সংগঠন	৪৩-৫৬
পঞ্চম	বাজার	৫৭-৬৯
ষষ্ঠ	জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ	৭০-৮০
সপ্তম	অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা	৮১-১০১
অষ্টম	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১০২-১১৮
নবম	বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ	১১৯-১৩৫
দশম	বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা	১৩৬-১৫২

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতি পরিচয়

Introduction to Economics

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম অর্থনৈতিক সংগ্রাম করে। মানুষ আজীবন নানাবিধ বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলে। মানুষের চলার পথের অর্থনৈতিক সমস্যা বা বাধা অতিক্রম করতে অর্থনীতি বিষয় নানাভাবে সহায়তা করে। মানুষ, সমাজ বা দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে অর্থনীতি বিষয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতি বিষয় সম্পর্কে জানা বা শেখা সে জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ; প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা; অর্থনীতির সংজ্ঞা ও নীতি; আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব;
- দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অর্থনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- অর্থনীতির প্রধান দশটি নীতি বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব এবং
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা মূল্যায়ন করতে পারব।

১.১ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

আজকের যে অর্থনীতি আমরা পড়ি, তা পূর্বে এতটা জটিল ছিল না। সনাতন বা আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় এবং বাড়িঘর– এসবই ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা। দ্রব্যসামগ্রী বিনিময়ের রীতি ছিল খুব সীমিত। মূলত মানুষের কায়িক পরিশ্রম ছিল উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ। সমাজে কোনো শ্রেণিভেদ ছিল না। 'দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ'– এই ছিল আদিম সমাজের মূলমন্ত্র। উৎপাদন ও ভোগ ছিল ঐ সমাজের প্রধান বিষয়। হজরত মুসা (আ.)-এর সময়ে অর্থাৎ ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব হিব্রু (Hebrew) সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থে বা দর্শনের বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ে সরলভাবে কিছু আলোচনা হতো। আইন, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন এবং অর্থনীতি তখন একসঙ্গে আলোচিত হতো। অর্থনীতি বিষয়ের আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না। উৎপাদন, ভোগ ও দৈনন্দিন সংসার পরিচালনার বিদ্যাকেই তখন অর্থনীতি বলা হতো।

অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ Economics গ্রিক শব্দ *Oikonomia* থেকে এসেছে। *Oikonomia* অর্থ গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা (*Management of the Household*)। প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিলেন গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত দুই চিন্তাবিদ। এ দুজন চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমিকের মজুরি, দাসপ্রথা ও সুদসহ অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বৃহত্তর পরিসরে সারা দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৫৯০-১৭৮০) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে, তাকে 'বাণিজ্যবাদ' (Mercantilism) বলা হয়। দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য উদ্বৃত্তকরণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বেশি রপ্তানি করত এবং খুব সামান্যই আমদানি করত। ইংল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে মূল্যবান ধাতু (সোনা, রুপা, হীরা ইত্যাদি) আমদানি করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসিরা সে দেশের ধনী মানুষের বিলাসী জীবনযাপন, অতিরিক্ত করারোপ এবং ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ভূমিবাদ (Physiocracy) মতবাদ প্রচার করেন। ভূমিবাদীদের মতে, কৃষিই (খনি ও মৎসক্ষেত্রসহ) হলো উৎপাদনশীল খাত। অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ই অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে মনে করা হতো।

এভাবেই প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অর্থনীতিবিষয়ক আলোচনা ক্রমশ নানা বিষয়ের সমন্বয়ে জটিল হতে থাকে। রাজনৈতিক অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" রচনা করেন। আধুনিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো অ্যাডাম স্মিথের এ বইটি।

কাজ : অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ ধারাবাহিকভাবে লিখো।

ফর্মা

১.২ দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা : দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব

মানুষ যা চায় তার সবকিছু পায় না। মানুষের এই না পাওয়া-চাওয়ার নাম অভাব। মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি একজন শিক্ষার্থী। ধরো, তোমার কাছে এক হাজার টাকা আছে। তোমার শার্ট, প্যান্ট এবং ভালো জুতা দরকার। এভাবে দেখা যাবে তোমার অনেক কিছু দরকার। কিন্তু তোমার আছে মাত্র এক হাজার টাকা। তোমার প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অনেক কম। অর্থনীতিতে এটাকে 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা' বলে। দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মানুষ গুরুত্ব অনুযায়ী পছন্দ বা নির্বাচন করে। পছন্দ করার প্রয়োজন না হলে অর্থনীতি বিষয়েরও প্রয়োজন থাকত না। অর্থনীতি শেখায় কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব (Scarcity and Unlimited Wants)

চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়াই মানুষের মূল সমস্যা। যেকোনো দ্রব্য (যেমনঃ বই) বা সেবাসামগ্রী (চিকিৎসা সেবা) উৎপাদন করতে সম্পদ দরকার হয়। কিন্তু 'সম্পদ সীমিত'। সীমিত সম্পদ দিয়ে সীমিত দ্রব্য বা সেবা পাওয়া সম্ভব। সে জন্যই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সব অভাব পূরণ হয় না। দুষ্প্রাপ্যতার কারণ এটাই। সম্পদ অসীম হলে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হতো না। অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসনের মতে, সম্পদ সীমিত বলেই সমাজে সম্পদের সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহারের প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। সূর্যের আলো, বাতাস ইত্যাদি প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিসগুলোর চাহিদা অনেক। কিন্তু এগুলো পেতে আমাদের তেমন কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না। তাই এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণত অভাব দেখা দেয় না। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

১.৩ অর্থনীতির ধারণা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধিও অনেক বেড়েছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয় এখন অনেক উন্নত বা সমৃদ্ধ। প্রথমে যারা অর্থনীতি বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে সম্পদের উৎপাদন ও বন্টনের বিজ্ঞান বলে মনে করেন। এদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। অর্থনীতির এই ধারা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সরকারের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ (laissez faire) নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা: "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।" সম্পদকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। তাই সম্পদ আহরণ ও উৎপাদনই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য। স্মিথের সংজ্ঞার দুর্বলতা হলো : ১. অর্থনীতি মানুষের অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে মেটাবে, এই সংজ্ঞায় তার উল্লেখ নেই। ২. এই সংজ্ঞায় জাতীয় সম্পদের উপর অধিক জোর দেওয়া হলেও ব্যক্তি মানুষ ও তার কাজ-কর্মকে অবহেলা করা হয়েছে। ৩. সম্পদ আহরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও কী উপায়ে সম্পদ জোগাড় করা হবে তা বলা হয়নি। ৪. এই সংজ্ঞায় সম্পদ বলতে দ্রব্যকেই বোঝানো হয়েছে, কিন্তু সেবা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

অধ্যাপক মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল সম্পদের চেয়ে মানবকল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, "অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।" অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপার্জন এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয়। অর্থাৎ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।

মার্শাল শুধু মানুষের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমানে সম্পদের স্বল্পতার সমস্যাই অর্থনীতির মূল সমস্যা। মার্শালের সংজ্ঞায় মানুষের এ মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়নি। মার্শাল ও তাঁর অনুসারীগণ রবিন্স, জেবন্স, ওয়ালরাস, এজওয়ার্থ, প্যারেটো প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ নব্য ক্লাসিক্যাল হিসেবে পরিচিত।

অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।" এ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। ২. অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত। ৩. অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায়, তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। ৪. সম্পদের জোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়। ৫. অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

রবিন্সের সংজ্ঞাটির সমালোচনা : ১. রবিন্স অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে বেশি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। ২. মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এমন কিছু পছন্দ করে, যা অর্থনীতিতে আলোচনা হয় না। ৩. অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য যে মানবকল্যাণ তার উল্লেখ নেই। ৪. রবিন্সের সংজ্ঞায় অর্থনীতির সামাজিক পছন্দকে আলোচনা করা হয়নি। ৫. আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার সংজ্ঞায় আসেনি। ৬. রবিন্স অর্থনীতিতে শুধু মূল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু জাতীয় আয়, নিয়োগব্যবস্থা, বিনিয়োগ, বণ্টন ইত্যাদি আলোচনা করেননি।

কেইনসীয় অর্থনীতির ধারণা

১৯৩০ এর দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রেক্ষাপটে ক্লাসিক্যাল ও নব্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের বাজার অর্থনীতিকেন্দ্রিক laissez faire নীতিটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ সময়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস মহামন্দা থেকে অর্থনীতির উত্তোরণে সরকারের হস্তক্ষেপের পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন। কেইনসের মতে, বিভিন্ন কারণে বাজারব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ অর্থাৎ সরকারি ব্যয়-বৃদ্ধি ও কর হার হ্রাসকরণের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থনীতিকে মন্দা অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে সহায়তা করে।

১.৩.১ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

অর্থনীতির আলোচনার প্রধান দুটি শাখা হলো :

১. ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics)

২. সামষ্টিক অর্থনীতি (Macroeconomics)

ব্যষ্টিক অর্থনীতি 'ক্ষুদ্র' বিষয় (Individual Decision Making Units) নিয়ে আলোচনা করে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে 'বৃহৎ' বা সমগ্র সম্পর্কিত বিষয় (Aggregate Economic Behavior) নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য

ব্যষ্টিক অর্থনীতি : অর্থনীতির যে শাখায় একক বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি (Individual), একটি পরিবার (A Household), একটি খামার (A Firm), এর আচরণ বা কোনো একটি দ্রব্যের (A Commodity) বাজার বিশ্লেষণ করা হয় তা হচ্ছে ব্যষ্টিক অর্থনীতি।

সামষ্টিক অর্থনীতি : অর্থনীতির যে শাখায় সমগ্র অর্থনীতির (যেমন: মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ, জাতীয় উৎপাদন, বেকারত্ব, সরকারের আয়-ব্যয়, মূল্যস্ফীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি) আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তা হলো সামষ্টিক অর্থনীতি।

১.৪ অর্থনীতির দশটি নীতি

আমাদের সমাজে সম্পদ স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে অসীম অভাব মোকাবিলা করতে হয়। অর্থনীতিবিদ গ্রেগরি ম্যানকিউয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো–

১। মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয় (People Face Trade-Offs)

পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে মোট সময় ব্যয় করো, তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে পড়া থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ তুমি যদি টিভি দেখো, তবে খেলাধুলার পেছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না। সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে, তবে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমাতে হবে। অর্থাৎ সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade Offs) নীতি মেনে চলেন।

২। সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

তুমি যদি স্কুলে লেখাপড়ার জন্য সময় ব্যয় কর, তবে তুমি তোমার বাড়িতে তোমার বাবার কাজে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ তুমি বাড়িতে কোনো একটি অর্থনৈতিক কাজ করলে তা থেকে তোমাদের পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারত। কিন্তু সে সময় তুমি স্কুলে লেখাপড়া করছ। এখানে লেখাপড়া করার জন্য বাড়িতে কাজ করতে না পারা লেখাপড়ার সুযোগ ব্যয়। সাধারণত যেসব সুযোগ থেকে তুমি বঞ্চিত হচ্ছ তার মধ্যে সবচেয়ে দামি সুযোগটিকেই সুযোগ ব্যয় বলা হয়।

৩। যুক্তিবাদী মানুষ প্রান্তিক পর্যায় নিয়ে চিন্তা করে (Rational People Think at the Margin)

মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে। বিয়েবাড়িতে খাওয়া শেষে তোমরা কেউ কেউ ভাবো আরও একটু খেতে পারতাম, আবার কেউ কেউ ভাবে আর একটু কম খেলে ভালো হতো। এই অল্প একটু বেশি বা অল্প একটু কম খাওয়া হচ্ছে প্রান্তিক খাওয়া। ধরো, তুমি একটি বিষয়ে A পেলে, তোমার মনে হবে আরেকটু পড়লেই A+ পেতাম। মানুষ প্রান্তিক সুবিধা-অসুবিধার কথাও ভাবে। ধরো, তুমি পর পর তিনটি কলা খেলে। তিন নম্বর কলাটি হলো প্রান্তিক কলা। প্রান্তিক কলা খেয়ে তুমি যে তৃপ্তি পেলে, তার নাম প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক বা তিন নম্বর কলাটি পেতে তুমি যত টাকা ব্যয় করলে, তার নাম প্রান্তিক ব্যয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে তুমি তখনই প্রান্তিক কলাটি খাবে, যখন প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে।

৪। মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় (People Respond to Incentives)

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। তোমার বাবা যদি বলেন তুমি পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫ পেলে তিনি তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দেবেন। নিশ্চয়ই তোমার ভেতরে পড়াশোনা করার উৎসাহ আরও বেড়ে যাবে। তেমনি অর্থনীতিতে শ্রমিক প্রণোদনা পেলে বেশি উৎপাদন করে।

৫। বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় (Trade can Make Everyone Better-Off)

যুক্তরাষ্ট্র সস্তায় গাড়ি তৈরি করে, তবে আমাদের রয়েছে সস্তায় পোশাক তৈরির সামর্থ্য। এখন আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সস্তা পোশাকের বিনিময়ে সস্তা গাড়ির বাণিজ্য করি তাহলে আমাদের উভয়েরই লাভ হবে।

৬। অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য সচরাচর বাজার একটি উত্তম পন্থা (Markets are Usually a Good Way to Organize Economic Activities)

অর্থনৈতিক কাজকর্ম সচরাচর সংগঠিত হয়ে থাকে বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে। ফার্ম ও পরিবারসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ফার্মের মালিকরা বাজারের চাহিদা দেখে দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অসংখ্য পরিবার তাদের আয় ও প্রয়োজন অনুসারে এ সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে। চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়।

৭। সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে (Governments Can Sometimes Improve Market Outcomes)

বাজারব্যবস্থা সাধারণত নানাধরনের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বাজারব্যবস্থা নির্দিষ্ট একজনের বদলে বহুজনের সম্মিলিত 'অদৃশ্য হাতের ইশারায় চলে। কিন্তু সব সময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। নানা কারণে অদৃশ্য হাত সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে।

গণদ্রব্য সরবরাহ যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে অপারগতা, একচেটিয়া সম্পদের কেন্দ্রীভবন, পরিবেশদূষণ এবং দুর্নীতির মতো বিষয়গুলো থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার হয়। বাজারের হাত অদৃশ্য হলেও, সরকারের হস্তক্ষেপ দৃশ্যমান থাকে।

৮। একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতার উপর (A Country's Standard of Living Depends on its Ability to Produce Goods and Services)

যেসব দেশের মানুষের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতা বেশি, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উন্নত দেশসমূহের মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি বলে তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ৬৩,০৫১ মার্কিন ডলার এবং জাপানের মাথাপিছু আয় ৪১,৬৩৭ মার্কিন ডলার (উৎস বিশ্বব্যাংক)। ফলে গড়পড়তা তারা উন্নত খাবার গ্রহণ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভ করে। শ্রমিকদের কর্মক্ষমতাও বাড়ে। অল্প সময়ে, অল্প শ্রমে তারা অনেক বেশি দ্রব্য ও সেবা তৈরি করতে পারে।

৯। যখন সরকার অতি মাত্রায় মুদ্রা ছাপায়, তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় (Prices Rise When the Government Prints Too Much Money)

মুদ্রা ছাপানোর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অধিক মাত্রায় মুদ্রা ছাপায়, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্যস্তর বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মান বা মূল্য কমে যায়। ধরো, তুমি ৫০০/- টাকা খরচ করলে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে যাও। কিন্তু টাকার মান কমে যাওয়ায় ঐ সামগ্রী পেতে তোমাকে ৬৫০/- টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে; যা পূর্বের ৫০০/- টাকার চেয়ে (৬৫০/- − ৫০০/-) = ১৫০/- টাকা বেশি। জিনিসের দাম বাড়ায় একই জিনিস কিনতে এখন বেশি মুদ্রা লাগবে।

১০। সমাজে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে (Society Faces a Short-Run Trade-Off between Inflation and Unemployment)

দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না–এরা হলো বেকার। সাধারণত অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি কমলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে বেকারত্ব কমে।

১.৫ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দুটি খাত)

অর্থনীতিতে যারা উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ ও বন্টনের সাথে জড়িত থাকেন তাদেরকে অর্থনৈতিক প্রতিনিধি (Economic agent) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ প্রতিনিধিগণ একে অপরের সাথে বাজার প্রক্রিয়ায় মিথস্ক্রিয়া (Interaction) করে থাকে।

একটি সরল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি (Agent) থাকে। ভোক্তা বা পরিবার এবং উৎপাদক বা ফার্ম। এই দুই ধরনের প্রতিনিধির মধ্যে আয়-ব্যয় কীভাবে চক্রাকারে প্রবাহিত হয়, তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

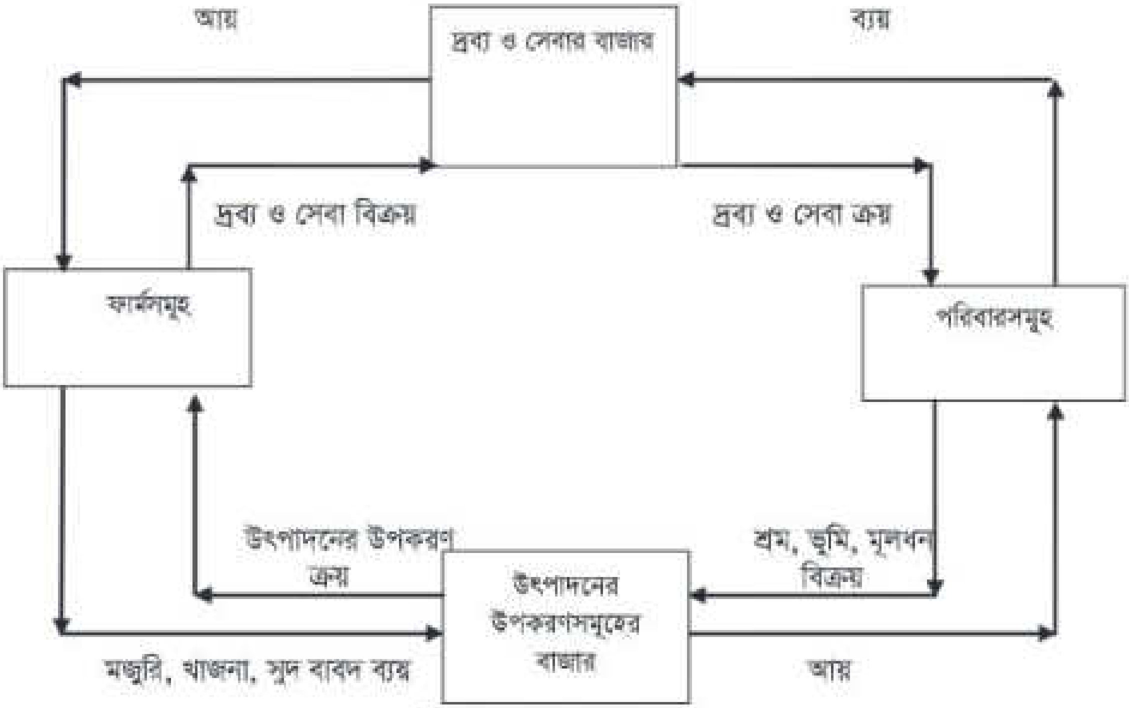

চিত্র : আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ

উপরোক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতিতে দু-ধরনের প্রতিনিধি (Agent) থাকে। যথা: ফার্মসমূহ ও পরিবারসমূহ। ফার্ম বা ফার্মের মালিকরা উৎপাদনের উপাদানগুলো ক্রয় করেন। পরবর্তীতে সেগুলো সংগঠিত করে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করেন এবং সেগুলোই বাজারে সরবরাহ বা বিক্রয় করেন। অন্যদিকে 'পরিবারসমূহ' তাদের মালিকানাধীন উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যেমন: শ্রম, ভূমি ও মূলধন বিক্রি করে আয় বা উপার্জন করেন (শ্রমিক আয় করেন মজুরি, ভূমির মালিক উপার্জন করেন খাজনা এবং মূলধনের মালিক লাভ করেন সুদ, আর এদের সকলের খরচ মিটিয়ে উদ্যোক্তা নিজেদের জন্য বাড়তি লাভ রেখে বাজারে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিষয়টি বিক্রয় করেন। সে জন্য উদ্যোক্তার অবশিষ্ট আয়টিকে বলা হয় মুনাফা)। পরিবারসমূহ তাদের আয়-উপার্জনের সাহায্যে ফার্মের কাছ থেকে ক্রয় করেন দ্রব্য বা সেবা। এ ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা এবং আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। একেই আমরা নাম দিয়েছি 'আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ'।

১.৬ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Different Types of Economic Systems)

আমাদের সম্পদ সসীম কিন্তু অভাব অসীম। সম্পদের সীমাবদ্ধতা বা দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity) মানবজীবনের অর্থনৈতিক বাস্তবতা। সীমিত সম্পদের মাধ্যমে আমরা সব অভাব পূরণ করতে পারি না। এ কারণে আমাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। ব্যাপকার্থে এ সমস্যাগুলোকে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়। সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

ক) আমরা কী উৎপাদন করব এবং কী উৎপাদন করব না? যেমন: আমরা কি ধান উৎপাদন করব, না কি কাপড় উৎপাদন করব ?

খ) আমরা যা উৎপাদন করতে চাই, তা উৎপাদন করার জন্য কী ধরনের প্রযুক্তি বা যন্ত্র ব্যবহার করব ? কাপড় কি আমরা শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি তাঁত দিয়ে তৈরি করব, নাকি পুঁজি নিবিড় মেশিনে তৈরি করব ?

গ) আমরা যা উৎপাদন করব তা আমরা কাদের জন্য করব ? কারা এটা ভোগ করবেন?

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা
২. সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা
৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা
৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা

১. ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থা (Capitalistic or Market Economic System)

এই অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ আডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারীগণ এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Capitalistic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

১। **সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা :** ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। ব্যক্তি এগুলো হস্তান্তর ও ভোগ করে থাকে।

২। **ব্যক্তিগত উদ্যোগ :** ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এসব উদ্যোগে সরকারের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়।

৩। **অবাধ প্রতিযোগিতা :** এ ব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে প্রথমে অনেক ফার্ম অবাধে প্রতিযোগিতা করে। ফলে তখন দ্রব্যের দাম কম থাকে এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।

৪। **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা :** বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

৫। **মুনাফা অর্জন :** ধনতন্ত্রে উৎপাদক সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন করে।

৬। **ভোক্তার স্বাধীনতা:** প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে।

৭। **আয় বৈষম্য :** ধনতান্ত্রিক সমাজে বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বেশি থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কিছুটা বেকারত্ব অনিবার্য।

৮। **সরকারের ভূমিকা :** এ ব্যবস্থায় সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশরক্ষা, সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেউ নিঃস্বার্থভাবে নয়, বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে।

সমাধান

ক) এই অর্থব্যবস্থায় সমস্ত সিদ্ধান্তই বাজারের যুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। যেমন- যে পণ্যের চাহিদা বাজারে বেশি হবে এবং যার দাম বেশি হবে, সেটাই বেশি বেশি করে উৎপাদিত হবে। বাজারের আপেক্ষিক চাহিদাই নির্ধারণ করে দেবে উৎপাদনের বিন্যাস।

খ) যে প্রযুক্তিতে একটি পণ্য তৈরি করার বাজার নির্ধারিত খরচ সর্বনিম্ন, সে প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ঐ পণ্য তৈরি হবে।

গ) বাজারে যে উৎপাদন উপকরণের দাম যে রকম নির্ধারিত হবে, তার মালিকরা ঠিক সে রকম আয় ও ভোগ করবেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ ব্যবস্থায় বাজার দ্বারাই উপকরণের মালিকদের এবং ক্রেতা-বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে কী উৎপাদিত হবে, কীভাবে উৎপাদিত হবে এবং উৎপাদনের বন্টন কী রকম হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা হচ্ছেন ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত সম্পদের তথা উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তি মালিক এবং বাজারে তাদের আন্তক্রিয়ার মাধ্যমেই এসবের দাম ও অন্য সবকিছু নির্ধারিত হয়।

২. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা (Socialist or Command Economic System)

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের উপর রাষ্ট্রের বা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধিকাংশে শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার বা সমাজ এবং সেগুলো সরকারি বা সামাজিক নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে। কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে তা সরকার বা রাষ্ট্র নির্ধারণ করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Socialist Economy)

১। **সম্পদের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা :** সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অধিকাংশ সম্পদ (জমি, কলকারখানা, খনি ইত্যাদি) ও উৎপাদনের উপাদানগুলোর মালিক হলো সরকার, সমবায় প্রতিষ্ঠান, যৌথ সামাজিক দল ইত্যাদি রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করে থাকে।

২। **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা :** রাষ্ট্র বা সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে সকল পরিকল্পনা করে থাকে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে দেশের উৎপাদন ও বন্টন পরিচালিত হয়।

৩। **ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব :** সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। কোনো ভোক্তা ইচ্ছাকৃত অর্থ ব্যয় করে বাজারকে প্রভাবিত করে কোনো কিছু উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে না।

৪। **অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব :** অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হওয়ায় সেখানে বহুসংখ্যক বেসরকারি উদ্যোক্তার অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না।

৫। **ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি :** সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে জাতীয় চাহিদা ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই সরকারের এবং সামাজিক মালিকানার অধীনে থাকে বলে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না।

সমাধান

এই অর্থব্যবস্থায় কি উৎপাদন হবে, তা নির্ধারণ করে দেয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। এখানে সমস্ত সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণের মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র বা সমাজ। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ই চূড়ান্ত বিচারে কী উৎপাদিত হবে, তার জন্য কী প্রযুক্তি বাছাই হবে, কার কী দাম হবে, কার কী আয় ও ভোগ হবে ইত্যাদি সব নির্ধারণ করে দেন। তাদের এই আদেশ অনেকটা আইনের মতো সকল অর্থনৈতিক খেলোয়াড়কে মেনে চলতে হয়। তাই এই ব্যবস্থাকে নির্দেশমূলক ব্যবস্থা (Command System) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থ বা মুনাফার চেয়ে সামাজিক স্বার্থ বা সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

দলগত কাজ : ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনা করে উপস্থাপন করো।

৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economic System)

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। যথা: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, বাংলাদেশ ও ভারত ইত্যাদি।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mixed Economy)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়ে থাকে। সাধারণত মিশ্র অর্থব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়:

১। **সম্পদের ব্যক্তিগত, সমবায় ও সরকারি মালিকানা :** মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অবাধে ভোগ করতে পারে ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। পাশাপাশি গণদ্রব্য (মহাসড়ক) ও সেবা (স্বাস্থ্যসেবা) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানত সরকার পরিচালনা করে।

২। **ব্যক্তিগত উদ্যোগ :** মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বণ্টন ও ভোগসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

৩। **সরকারি উদ্যোগ :** মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে।

৪। **মুনাফা অর্জন :** মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। তবে তা অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা নয়।

৫। **ভোক্তার স্বাধীনতা :** এ ব্যবস্থায় ভোক্তা সাধারণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন– ধূমপান, মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ ইত্যাদি।

বিশ্বে কোথাও বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা না থাকায় অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করেন। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি খাত পাশাপাশি অবস্থান করে। এ কারণে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পাশাপাশি সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থা (Islamic Economic System)

ইসলামের মৌলিক নিয়ম-কানুনের উপর বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic Economy)

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রচলিত বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১। **ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস :** ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতিমালা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের ধর্মীয় দর্শন, ধর্মগ্রন্থের বিধান ও ধর্মীয় প্রচলিত প্রথা ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রণীত ও পরিচালিত হয়।

২। **সুদমুক্ত আমানত :** ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ গ্রহণের স্বীকৃতি নেই। এখানে ব্যাংক-ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানতের ব্যবস্থা করা হয়।

৩। **জাকাত ও ফিতরা :** এ ব্যবস্থায় জাকাতভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জাকাত ও ফিতরার মাধ্যমে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে তা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

এ অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত বিধান অনুসরণ করে চলতে হয়।

কাজ: বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে কোন অর্থব্যবস্থার মিল রয়েছে? মতামত দাও।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব বলতে কী বোঝায়?

২. অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও।

৩. আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ বলতে কী বোঝায়?

৪. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কী?

৫. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

২. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। কোন সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন?

৩. অর্থনীতির দশটি নীতি আলোচনা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতির জনক কে?

ক. ডেভিড রিকার্ডো খ. এরিস্টটল

গ. অ্যাডাম স্মিথ ঘ. এল রবিন্স

২. অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তম পন্থা। কেননা এতে–

i. দর-কষাকষি করা যায়

ii. সস্তায় ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করা যায়

iii. চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নাবিল বাজারে চিনি কিনতে গিয়ে দেখলেন, চিনির দাম অনেক বেশি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ক্রেতা বলল, রাস্তার ওপারে এই চিনি সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হচ্ছে।

৩. নাবিলের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

ক. ইসলামি খ. মিশ্র

গ. ধনতান্ত্রিক ঘ. সমাজতান্ত্রিক

৪. নাবিলের দেশের অর্থব্যবস্থায়–

ক. আয়বৈষম্য দেখা দেয়
খ. সুদবিহীন ঋণের লেনদেন হয়
গ. মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে
ঘ. ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নদীর বাবা তাকে বলে– "তুমি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দেবো।" নদী এটি শুনে খুশি হয় এবং চিন্তা করে, সে সাইকেল পেলে সাইকেল দিয়ে কলেজে যেতে পারবে। এতে তার যাতায়াত ভাড়া বাচবে। তাই সে খেলাধুলা ও টেলিভিশন দেখা কমিয়ে দিয়ে বেশি করে পড়াশোনা করবে ভালো রেজাল্টের জন্য।

ক. ভূমিবাদীদের মতে উৎপাদনশীল খাত কোনটি?
খ. দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকটিতে অর্থনীতির কোন কোন বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো বিষয় রয়েছে? তোমার মতামত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করো।

২. আসাদ দীর্ঘদিন 'A' দেশে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি মাতৃভূমি বাংলাদেশে বেড়াতে এসে ছোট ভাইকে তার প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনান। সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। সেখানে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তার মালিককে কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়নি। আবার সে তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে।

ক. অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখো।
খ. অর্থনীতিতে প্রণোদনার গুরুত্ব বর্ণনা করো।
গ. 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

The Important Ideas of Economics

অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা জরুরি। সম্পদ ও দ্রব্যের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণি বিভাগ, সুযোগ ব্যয় ও চয়ন, আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতির মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এ মৌলিক ধারণাগুলো অর্থনীতিকে বুঝতে সহায়ক হবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- অর্থনৈতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ এবং উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পদ চিহ্নিত করতে পারব;
- দ্রব্য কী তা বর্ণনা করতে পারব;
- অবাধলভ্য দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্যের বা পণ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগদ্রব্যের তুলনা করতে পারব;
- মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনি দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- সুযোগ ব্যয় ও চয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব এবং
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির খাতওয়ারি তালিকা তৈরি করতে পারব।

২.১ অর্থনৈতিক সম্পদ

আমরা সবাই 'সম্পদ' শব্দটির সাথে কমবেশি পরিচিত। আমাদের প্রতিদিনের আলোচনায় অনেকভাবে সম্পদ শব্দটি আসে। যেমন মি. সুজন অনেক সম্পদের মালিক। একজন অর্থনীতিবিদের কাছে সব জিনিস সম্পদ নয়। অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য, যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংক্ষেপে আমরা এ দ্রব্যগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্যও বলে থাকি। যেমনঃ ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। উল্লিখিত জিনিসগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হবে। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয়, তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১। **উপযোগ :** উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতা। কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে সেই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে। উপযোগ নেই এমন দ্রব্য বা সেবা মানুষ অর্থ দিয়ে কেনে না।

২। **অপ্রাচুর্যতা:** কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও জোগান সীমিত থাকবে। যেমন : নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান প্রচুর। এগুলো সম্পদ নয়। তবে শ্রম ব্যবহার করে পানিকে বোতলবন্দি করলে পানিসম্পদে পরিণত হয়। অন্যদিকে জমি, গ্যাস, যন্ত্রপাতি–এগুলো চাইলেই প্রচুর পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এগুলো আমাদের কাছে অপর্যাপ্ত দ্রব্য। এগুলোও সম্পদ।

৩। **হস্তান্তরযোগ্য :** সম্পদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর হস্তান্তরযোগ্যতা। হস্তান্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায়, তা-ই হলো সম্পদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যাবে না। কারণ তার প্রতিভাকে হস্তান্তর বা মালিকানা বদল করা সম্ভব নয়। আবার টিভির মালিকানা বদল করা যায় বলে টিভি সম্পদ।

৪। **বাহ্যিকতা :** যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ বোঝায়, তা অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়। কেননা এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। যেমন : কোনো ব্যক্তির কম্পিউটারের উপর বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিংবা কারো শারীরিক সৌন্দর্য বা চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পদ বলা যাবে না। তবে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে নানাভাবে এগুলোকেও বিক্রয়যোগ্য সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

উৎস বা উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার। যথা-

১। **প্রাকৃতিক সম্পদ :** প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায়, তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমনঃ ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি।

২। **মানবিক সম্পদ :** মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন: শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ।

৩। **উৎপাদিত সম্পদ :** প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

কাজ : অর্থনীতির ভাষায় নিচের কোনগুলো সম্পদ তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
গম, চাল, কবির প্রতিভা, কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা, নদীর বালি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। উন্নয়নের সাথে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে। এ দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

ক. কৃষিসম্পদ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে রয়েছে পলিসমৃদ্ধ উর্বর কৃষিজমি। আমাদের জমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদ-নদী প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। এ দেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৪৫৪.০৪ লাখ মেট্রিক টন। আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের প্রায় ৬৩% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০১৬-১৭ সালের Labor Force Survey অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২% কৃষিতে নিয়োজিত। জাতীয় আয়ের (জিডিপি-র) প্রায় ১৩.৩৫% কৃষি থেকে আসে।

খ. খনিজসম্পদ

বাংলাদেশ খনিজসম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। এখানে এ পর্যন্ত যেসব খনিজসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজসম্পদ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী এ যাবৎ দেশে ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে গ্যাসের মোট মজুদ প্রায় ৩৯.৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্রগুলো হলো বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশীদপুর, সিলেট, তিতাস, বেলাবো (নরসিংদী), মেঘনা, শাহবাজপুর, সেমুতান, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, রূপগঞ্জ, সালদা নদী, জালালাবাদ, বিয়ানিবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা ও বাঙ্গুরা ইত্যাদি। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানা ও গৃহে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. **চুনাপাথর** : সিমেন্ট, কাচ, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেটের ভাঙ্গারহাট ও বাগলীবাজার, সুনামগঞ্জের টেকেরহাট, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ এবং কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে।

৩. **চীনামাটি** : নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় চীনামাটি পাওয়া যায়। এটি বাসনপত্র, সেনিটারি দ্রব্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪. **কয়লা** : বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লার পাঁচটি ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।

৫. **কঠিন শিলা** : দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুর জেলার রাণীপুকুরে কঠিন শিলার মজুদ রয়েছে। বর্তমানে এসব খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। রাস্তা, রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এ শিলা দরকার হয়।

৬. **সিলিকা বালু** : হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও জামালপুরে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। এটি কাচ, রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৭. **গন্ধক** : বারুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানা, তেল পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গন্ধক লাগে। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৮. **খনিজ তেল** : সিলেটের হরিপুরে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে।

৯. **তামা** : রংপুর জেলার রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার স্তরে সামান্য তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার, মুদ্রা প্রভৃতি তৈরির জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

গ. বনজসম্পদ

বনভূমি ও বনজসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য যেকোনো দেশের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমি মোট ভূখণ্ডের প্রায় শতকরা ১৭.৬২ ভাগ, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। যেমন, আমেরিকায় শতকরা ৩৩.৮৪ ভাগ, জাপানে শতকরা ৬৭ ভাগ, বার্মায় শতকরা ৬৩ ভাগ এবং ভারতে শতকরা ২৩.৭০ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বন রয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

বাংলাদেশের বনভূমির ধরন, বনভূমির পরিমাণ, জেলাগত অবস্থান ও প্রধান প্রধান বৃক্ষসমূহ নিম্নের টেবিলে উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক নং	বনভূমির ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)	জেলাগত অবস্থান	প্রধান প্রধান বৃক্ষসমূহ
১	পাহাড়ি বন	১৩৭৭.০০	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ	গর্জন, চাপালিশ, চাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, সোনালু
২	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	৬১০.০০	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, গরান
৩	সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন	২০০.০০	নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	গেওয়া, বাইন
৪	শাল বন	১২০.০০	গাজীপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়	শাল বা গজারী
৫	জলাভূমির বন	২৩.০০	সিলেট ও সুনামগঞ্জ	হিজল, করচ, পিটালী, বরুন

সূত্র: বন অধিদপ্তর ২০২০

ঘ. প্রাণিজসম্পদ

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ ধরনের সম্পদ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। চামড়াশিল্পের কাঁচামালের জোগান দেয়। এ সম্পদ রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ঙ. শক্তিসম্পদ

কলকারখানা, যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। কয়েকটি উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। এগুলো হলো কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানিসামগ্রী।

বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও তা এখনও উত্তোলন করা শুরু হয়নি। সিলেটের হরিপুরে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোলিয়াম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও এ দেশে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে শক্তির জোগান বহুলাংশে প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও প্রচলিত উপকরণ থেকে আসে। আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কলকারখানা, গৃহকর্ম ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করি। এ দেশে পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। একে পানি বিদ্যুৎ বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত। গ্যাস, তেল, কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাকে তাপ বিদ্যুৎ বলে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়:

১. গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা

২. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া

৩. ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৪. সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নীলফামারী

এ দেশের গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো হলো–

১. সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ

২. আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নরসিংদী

৪. শাহজিবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিলেট

৫. চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এ দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি যেমন: কাঠ, খড়, গোবর, পাটখড়ি, তুষ, পাতা ইত্যাদি থেকেও তাপশক্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমান সরকার কুইক রেন্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ করা দরকার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বায়ুপ্রবাহ, সৌর তাপ ও জৈব গ্যাসকে শক্তি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আণবিক শক্তির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে এসব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।

চ. পানিসম্পদ

পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি, যথা : ১. নদ-নদী, খালবিল, পুকুর ও সমুদ্র; ২. বৃষ্টিপাত এবং ৩. ভূ-গর্ভস্থ পানি।

এ তিনটি উৎসের পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির জোগান কম বা বেশি হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র এলাকায় রয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ। নদীর স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। আমাদের অসংখ্য নদ-নদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ দেশের যাতায়াতব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য। নদ-নদীর পানি ও বৃষ্টিপাত দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়বে।

২.২ দ্রব্য

দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বুঝে থাকি। মানুষের অভাব মেটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত সব জিনিসকে আমরা দ্রব্য বলে থাকি। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে, অর্থনীতিতে তা-ই দ্রব্য। দ্রব্যকে নানাভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়। যেমন:

অবাধলভ্য দ্রব্য : যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন- আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক দ্রব্য : যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে অর্থ প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। এদের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বই, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

ভোগ্য দ্রব্য : ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় তাদেরকে ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন, গাড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি।

স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য : যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায়, তাকে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- ফ্রিজ, গাড়ি, ঘরবাড়ি, জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য : যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য স্বল্পকালে ভোগ করা যায় এবং কোনো ক্ষেত্রে একবার মাত্র ভোগ করা যায়, তাকে অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, তরিতরকারি ইত্যাদি।

মধ্যবর্তী দ্রব্য : যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন- কাঁচামাল, রসগোল্লা তৈরির জন্য ব্যবহৃত দুধ ও চিনি মধ্যবর্তী দ্রব্য।

চূড়ান্ত দ্রব্য : যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয়। যেমন- পাউরুটি, চেয়ার ইত্যাদি।

মূলধনি দ্রব্য : যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য, অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনি দ্রব্য বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। মূলধনি দ্রব্য বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলধনি দ্রব্য আবার মূলধনি দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

দ্রব্য ও পণ্য : অর্থনীতিতে পণ্য বলতে সাধারণত সেসব উপকরণকে বুঝি, যা চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আটা হচ্ছে পণ্য যা চূড়ান্ত দ্রব্য ব্রেড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রথাগতভাবে শস্য স্বর্ণ, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদিকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। সকল দ্রব্য পণ্য নয়। কিন্তু সকল অর্থনৈতিক দ্রব্যই পণ্য। সকল সেবা পণ্য নয়, কিন্তু সকল অর্থনৈতিক সেবাই পণ্য।

কাজ : কোনটি কোন ধরনের দ্রব্য তা উল্লেখ করো– আলো, নদীর পানি, টেবিল, জমি, অলংকার, যন্ত্রপাতি।

২.৩ সুযোগ ব্যয় ও চয়ন (Opportunity Cost and Choice)

সুযোগ ব্যয় : অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা 'সুযোগ ব্যয়'। মনে করো তুমি একজন শিক্ষার্থী। তুমি কি প্রতিদিন সব কাজ করতে পারবে? যেমন : তুমি একই সঙ্গে অর্থনীতি পরীক্ষা এবং মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে পারবে না। তুমি যদি একটি কাজ করতে চাও তবে অবশ্যই ঐ সময়ে অন্য কাজটি করা সম্ভব হবে না। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, মনে করো তোমাদের এক বিঘা জমি আছে। এ জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। ঐ জমিতে ধান চাষ না করে যদি পাট চাষ করতে চাও তবে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়– এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির 'সুযোগ ব্যয়' (Opportunity Cost)। সাধারণত নানারকম সুযোগ ব্যয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সুযোগ ব্যয়টিকেই অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়।
ধরা যাক, একটি দেশ তার সমস্ত সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির ব্যবহার করে ধান ও পাটের নিম্নোক্ত সমাবেশ উৎপন্ন করতে পারে।

সারণি-১ : উৎপাদন সম্ভাবনা

সমাবেশ	ধান (মিলিয়ন টন)	পাট (মিলিয়ন বেল)	১ মিলিয়ন ধানের সুযোগ ব্যয়
ক	০	১৫	-
খ	১	১৪	১
গ	২	১২	২
ঘ	৩	৯	৩
ঙ	৪	৫	৪
চ	৫	০	৫

উক্ত সারণির প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত চিত্র আঁকা যায়।

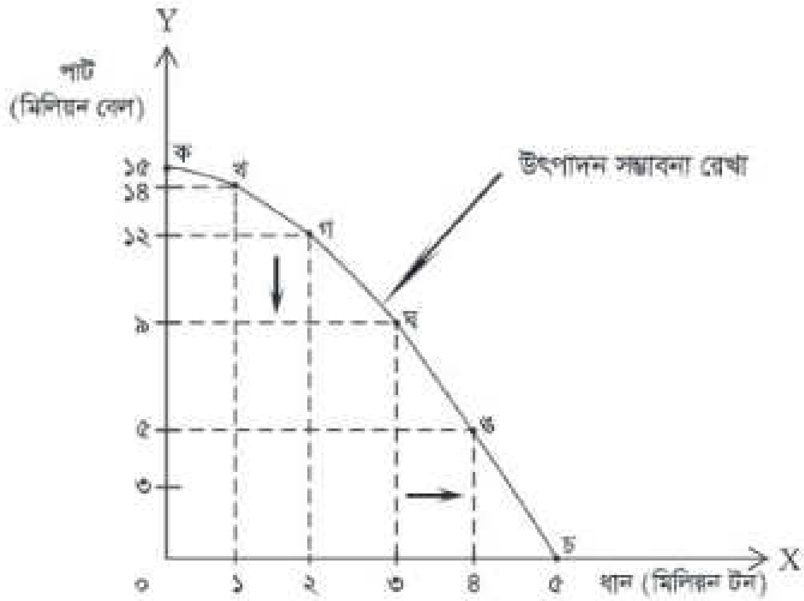

চিত্র-১ : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উপরের চিত্রে 'কচ' রেখাটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। রেখাটির এ বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে গেলে একটি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে গেলে আরেকটি দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয়। যেমন: 'গ' বিন্দু থেকে 'ঘ' বিন্দুতে গেলে ধানের উৎপাদন ১ একক বাড়ালে পাটের উৎপাদন ৩ একক হ্রাস পায়। অর্থাৎ ১ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় ৩ মিলিয়ন বেল পাট।

চয়ন : অসীম একজন কৃষক, তার তিন বিঘার একটি জমি আছে। উক্ত জমির সম্পূর্ণটিতে ধান অথবা গম চাষ করতে পারেন। এছাড়াও জমির কিছু অংশে ধান এবং কিছু অংশে গম চাষ করতে পারেন। উক্ত জমিতে শুধু ধান চাষ করলে ১২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন হতে পারে। আবার শুধু গম চাষ করলে ৮০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হতে পারে। এখন তিনি জমিটিতে কী চাষ করবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। ফসল উৎপাদনের জন্য তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই নির্বাচন বা চয়ন। অর্থনীতিতে সম্পদের স্বল্পতার জন্যই নির্বাচন করতে হয় এবং এটি ব্যক্তিপর্যায়ের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদের স্বল্পতার জন্য হয়ে থাকে।

কাজ : বাস্তব জীবনের সুযোগ ব্যয়সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ উল্লেখ করো।

২.৪ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

আয় : উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরি বলে। জমির জন্য প্রাপ্ত আয়কে খাজনা বলে। ধার করা অর্থ বা পুঁজি ব্যবহার করার জন্য পুঁজির মালিককে যে সুদ দেওয়া হয়, সেটি তার আয়। এ ছাড়া উদ্যোক্তা সব খরচ মিটিয়ে যে আয় করেন, সেটিকে মুনাফা বলা হয়।

সঞ্চয় : মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে ত্রিশ হাজার টাকা বেতন পান। সাতাশ হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা তিন হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y>C$)

$$= 30000\text{-}27000$$
$$= 3000$$

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়

আয় সঞ্চয় ও ভোগের সমষ্টিকে একটি পাই চার্টের সাহায্যে দেখানো যায়।

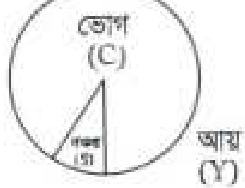

ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের উপর।

বিনিয়োগ : মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরো, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

> কাজ : বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে এ রকম ৪টি ক্ষেত্র উল্লেখ করো।

২.৫ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানাবিধ কাজ করে। এসব কাজের মূল লক্ষ্য হলো জীবিকা সংগ্রহ করা। জীবিকার জন্য কেউ কল-কারখানায়, কেউ অফিস বা জমিতে কাজ করে। জীবিকা সংগ্রহ ছাড়াও মানুষ খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন বা সন্তান প্রতিপালনের মতো কাজও করে। আবার অনেকে সমাজবিরোধী কাজের সাথেও জড়িত থাকে। উপরের সবগুলো কাজকে আমরা অর্থনৈতিক কাজ বলব না। উপরের এ কার্যাবলি আমরা দুভাবে ভাগ করি। যেমন- ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি, খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে, তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন- শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে—এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা— নতুন দ্রব্য ও সেবা পণ্য সৃষ্টি করা।

খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না, তাকে অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন- পিতামাতার সন্তান লালন-পালন, শখের বশে খেলাধুলা করা ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ।

২.৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনীতি ৩টি খাতের উপর নির্ভরশীল – কৃষি, শিল্প এবং সেবা। তবে সাম্প্রতিককালে জাতীয় আয়ে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে। জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ক্রমশ কমছে।

কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি : বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত। এ দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪০.৬২% শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৬৩% মানুষ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। জমিচাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশু পালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

শিল্পসংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজ : কৃষির পর শিল্পই হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় খাত। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হচ্ছে- তৈরি পোশাক, বস্ত্র, পাট, তুলা, চা প্রক্রিয়াকরণ, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, হিমায়িত মৎস্য, হালকা প্রকৌশল ইত্যাদি। শিল্পখাতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির বড় অংশ তৈরি পোশাক খাতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ৭৫-৮০% তৈরি পোশাক খাতের অবদান।

সেবা খাত : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে সেবা খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত (Maintenance & Repairs), প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে এ খাতের অন্তর্ভুক্ত সেবাসমূহ হচ্ছে- গৃহ ব্যবস্থাপনা, পর্যটন, নার্সিং, শিক্ষকতা ইত্যাদি। এ ছাড়া অনেকে দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, কর্মকার, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালার কাজ করে।

কাজ : বাংলাদেশের মানুষের কৃষিসংক্রান্ত এবং কৃষিবহির্ভূত ১০টি করে অর্থনৈতিক কাজের একটি তালিকা তৈরি করো।

[এই অধ্যায়ের প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

২. সম্পদের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

৩. দ্রব্য কী?

৪. দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

৫. সুযোগ ব্যয় কী?

৬. আয়ের সংজ্ঞা দাও।

৭. সঞ্চয় কী?

৮. বিনিয়োগ বলতে কী বোঝায়?

৯. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী?

১০. অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও।

৩. সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন বা চয়ন ব্যাখ্যা করো।

৪. বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ?

ক. ঘরবাড়ি খ. ডাকঘর

গ. পদ্মা নদী ঘ. খামারবাড়ি

২. ব্যবসায়ের সুনাম সম্পদ । কারণ এর-

i. অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে

ii. স্বত্ব পরিবর্তন করা যায়

iii. সামষ্টিক মালিকানা দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাহেলার একটি সেলাই মেশিন আছে। এর থেকে তাঁর মাসিক আয় ২০,০০০/- টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণপোষণ, সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয়পত্রে জমা করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরেকটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

৩. রাহেলার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে?

ক. সঞ্চয় খ. মূলধন

গ. বিনিয়োগ ঘ. সুযোগ ব্যয়

৪. রাহেলার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে—

i. পারিবারিক নিরাপত্তা বাড়বে

ii. সন্তানের প্রতি দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে

iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শফিকদের বাড়িতে কয়েকজন মেহমান এসেছেন। তার মা তাকে ১০০০/- টাকা দিয়ে কিছু মাছ ও মাংস কিনতে বাজারে পাঠান। সে বাজারে গিয়ে দেখে পুরো টাকা দিয়ে ২ কেজি মাছ অথবা ৪ কেজি মাংস কিনতে পারে। অনেক চিন্তার পর সে ১ কেজি মাছ এবং ২ কেজি মাংস ক্রয় করে।

ক. আয় কী?

খ. শক্তি সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

গ. শফিকের মাছ-মাংস ক্রয়ের ধারণাটি কীভাবে নির্ধারিত হয়? তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. শফিকের দুটি দ্রব্য নির্বাচনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

২. হাফিজ তাঁর কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মানুষকে সংগঠিত করার দক্ষতা তার অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের জন্য সদরঘাটে তাঁর একটি ঘর আছে। এখান থেকে তাঁর কর্মচারীরা তাঁর কথামতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন।

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে?

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

গ. হাফিজের সদরঘাটের ঘরটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. হাফিজের গুণাবলি কি সম্পদ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

উপযোগ, চাহিদা, জোগান ও ভারসাম্য

Utility, Demand, Supply and Equilibrium

এ অধ্যায়ে ধনতান্ত্রিক বা বাজারব্যবস্থার অধীনে উপযোগ, ভোগ, মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি, চাহিদা, জোগান, বাজার চাহিদা, বাজার জোগান রেখা ও ভারসাম্য দাম নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- উপযোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব;
- মোট উপযোগ যে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি তা প্রমাণ করতে পারব;
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দাম ও জোগানের পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব এবং
- ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করতে পারব।

৩.১ উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তা (Utility, Consumption and Consumer)

একজন ব্যক্তি তার অসীম অভাব পূরণের জন্য গুরুত্ব অনুসারে দ্রব্য ভোগ বা সেবা ব্যবহার করে। দ্রব্য ও সেবার মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা রয়েছে তাই উপযোগ। নিম্নে উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তার সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

উপযোগ : ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য অনেক দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয়। খাবারসামগ্রী, পরিধানের সামগ্রীসহ অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। এগুলো না থাকলে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারি না। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বইপত্র, ডাক্তারের সেবা প্রভৃতি দ্রব্য ও সেবা ব্যক্তিমানুষের অভাব মেটায়। অতএব, অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। উপযোগ একটি ব্যক্তিগত মানসিক ধারণা।

ভোগ : প্রতিদিন আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার করি বা এগুলো আমরা ভোগ করি। এখানে ভোগ বলতে কিন্তু এগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না। কেননা আমরা কোনো জিনিস ধ্বংস বা নিঃশেষ করতে পারি না। আমরা শুধু দ্রব্যগুলো ব্যবহারের দ্বারা এর উপযোগ গ্রহণ করতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে, অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা হবে না। যেমন : আগুনে আমার কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতএব, অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

ভোক্তা : যে ব্যক্তি ভোগ করে তাকে আমরা ভোক্তা বলি। বাজার অর্থনীতিতে কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে ভোক্তা বলা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তার সম্পর্ক নিবিড়। ভোক্তা দ্রব্যের ভোগ ও সেবার ব্যবহার এর মাধ্যমে উপযোগ পেয়ে থাকে।

কাজ : উপযোগ ও ভোগ্য পণ্যের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা দেখাও।

৩.২ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility)

মোট উপযোগ

বাজারে গিয়ে তুমি খাওয়ার জন্য একাধিক আম কিনতে চাও। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১ম আমটি কিনতে তুমি যে টাকা ব্যয় করো ২য়, ৩য় বা ৪র্থ বার আম ক্রয় করতে তা করো না। কারণ ১ম আমটি ভোগ করার পর তোমার আম খাওয়ার অভাব অনেকটা পূরণ হয়ে যায়। ২য় বার আমের প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ কমে যায়। ৩য়, ৪র্থ আমের ক্ষেত্রে আগ্রহ আরও কমবে। এমন হতে পারে যে, তুমি আর আম কিনবে না। কারণ আম খাওয়ার প্রতি সে সময়ে তোমার আর কোনো আগ্রহ থাকে না বা তোমার কাছে অতিরিক্ত আমের উপযোগ শূন্য। আম ক্রয় করতে তোমাকে টাকা ব্যয় করতে হয়। ধরি, ১ম আমটি তুমি কিনলে ৫ টাকায়, ২য় আমটি কিনতে তুমি ৪ টাকা দিতে রাজি থাকো, ৩য় আমের জন্য ৩ টাকা দিতে চাও এবং ৪র্থ আমের জন্য ২ টাকা। এভাবে (৫ + ৪ + ৩ + ২) = ১৪ টাকা দিয়ে তুমি ৪টি আম কিনলে। টাকাকে উপযোগের মাপকাঠি ধরলে এখানে ৪টি আমের মোট উপযোগ ১৪। অতএব, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। যেহেতু অতিরিক্ত আম থেকে ক্রমাগয়ে কম তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেহেতু ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।

প্রান্তিক উপযোগ

মনে করো তুমি ৩টি আম কিনেছ। এখন তুমি আবার আরেকটি আম কিনলে। এই অতিরিক্ত ৪র্থ আমটি হলো প্রান্তিক আম। এই প্রান্তিক আম থেকে তুমি যে তৃপ্তি বা উপযোগ পেলে, তাই প্রান্তিক উপযোগ। এই আম কিনতে তুমি ২ টাকা ব্যয় করলে এখানে প্রান্তিক উপযোগ হবে ২ টাকার সমান। অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

সূচির মাধ্যমে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের উপস্থাপন

আমের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৫	৫
২য়	৫ + ৪ = ৯	৪
৩য়	৯ + ৩ = ১২	৩
৪র্থ	১২ + ২ = ১৪	২
৫ম	১৪ + ১ = ১৫	১
৬ষ্ঠ	১৫ + ০ = ১৫	০
৭ম	১৫ - ১ = ১৪	-১

উপরের সূচিতে দেখা যায়, ১ম আমের দাম যখন ৫ টাকা প্রান্তিক উপযোগ তখন ৫ টাকা। ২য় আম কেনায় ১ম ও ২য় আমের ব্যয় ৯ টাকা। দুটি আম থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ৯ টাকা। ২য় আম থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকা। এভাবে ৪টি আম থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ১৪। ৪র্থ আমের প্রান্তিক উপযোগ ২। এভাবে আমের বিভিন্ন একক থেকে প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ ও -১ টাকা। ৬ষ্ঠ আমটির তোমার কাছে কোনো উপযোগ না থাকায় তুমি তা কিনবে না। আর ৭ম আমটি কিনলে তোমার মোট উপযোগ তখন কমে যাবে, যেহেতু ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক।

উক্ত ছক থেকে দেখা যায়, ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সামষ্টিক হলো মোট উপযোগ এবং অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগতয়ে হ্রাস পায়। মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। মোট উপযোগ হ্রাস পেতে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

২০১৮

কাজ : মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখো।

৩.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, তুমি বারবার একই আম খেলে আমের প্রতি তোমার আগ্রহ কমতে থাকে এবং উপযোগও কমে। উপযোগ কমে বলেই তুমি অতিরিক্ত একক আমের জন্য কম দাম দিতে চাও। ৩০নং পৃষ্ঠার সূচিতে দেখা যায়, ৬ষ্ঠ আমের জন্য প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (Zero) এবং ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (Negative)। অর্থাৎ একই জিনিস বারবার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। সুতরাং ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কিছু শর্ত মেনে চলে। তা হলো ক) ভোক্তা হবে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন; খ) ভোক্তা চাইলে দ্রব্যের উপযোগ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারে; গ) দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে; ঘ) দ্রব্যটি ভোগ করার সময় ভোক্তার আয়, রুচি এবং পছন্দের পরিবর্তন হবে না। ঙ) নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির ব্যাখ্যা

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়। নিচের চিত্রে ভূমি অক্ষে বা OX অক্ষে আমের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে বা OY অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ ও দাম দেখানো হয়েছে।

চিত্র :

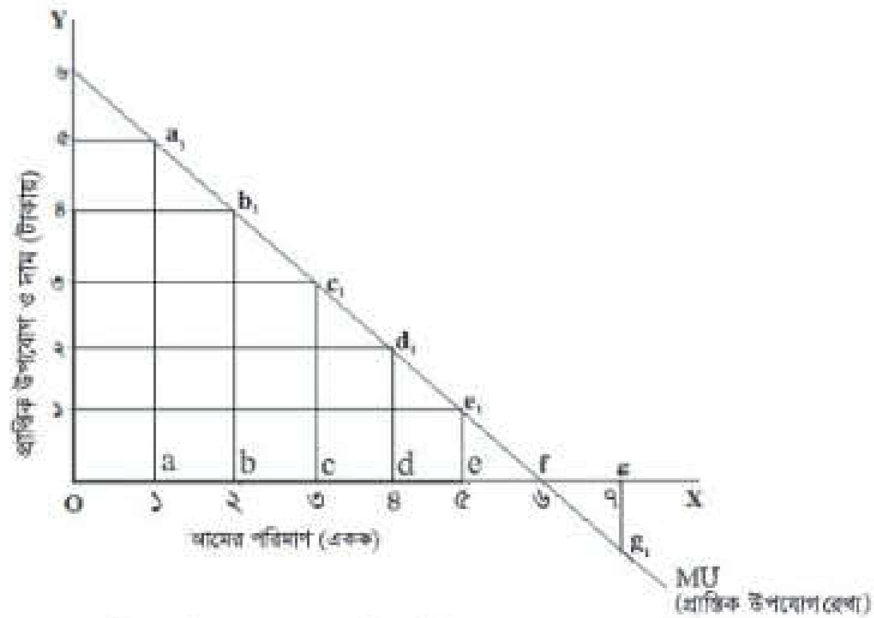

চিত্রে তুমি ১ম আম থেকে aa_1 পরিমাণ উপযোগ তথা প্রান্তিক উপযোগ লাভ কর এবং ১ম আমের জন্য ৫ টাকা দাম দাও। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম আম থেকে তুমি যথাক্রমে bb_1, cc_1, dd_1 এবং ee_1 পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ কর। অর্থাৎ ভোগ বাড়ার সাথে সাথে তুমি ২য় আমের জন্য

৪ টাকা, ৩য় আমের জন্য ৩ টাকা, ৪র্থ আমের জন্য ২ টাকা, ৫ম আমের জন্য ১ টাকা দিতে রাজি থাকো। ৬ষ্ঠ আমের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য এবং ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ -১.০০ টাকা। ভূমি অক্ষ রেখার f বিন্দু শূন্য প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করে। ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (-১ টাকা) বিধায় gg_1 তা নির্দেশ করে। এখানে $ee_1<dd_1<cc_1<bb_1<aa_1$। এ থেকে বুঝা যায়, আমের জন্য ভোগ বাড়ার সাথে সাথে তোমার কাছে অতিরিক্ত এককগুলোর উপযোগ ক্রমেই কমে যায়। এবার a_1, b_1, c_1, d_1, e_1, f এবং g_1 বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উপযোগ বা MU (Marginal Utility) রেখা পাওয়া যায়। রেখাটি ডান দিকে নিম্নগামী। এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে, ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। সে কারণেই প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। এই বিধির পূর্বশর্তগুলো অনুপস্থিত থাকলে এই বিধি কার্যকর হবে না যেমনঃ ডাকটিকেট সংগ্রহ।

৩.৪ চাহিদা (Demand)

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই। গাড়ি, সুন্দর বাড়ি, উন্নত খাবার ইত্যাদি। আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চাহিদা নয়। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন- ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, ২. ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য এবং ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা। সুতরাং ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা (Demand) বলে।

চাহিদাবিধি

তোমার মা তোমার বাবাকে বাজার থেকে ইলিশ মাছ আনতে বললেন। বাজার থেকে এসে তোমার বাবা বিরক্তির সাথে বললেন, ইলিশ মাছের দাম বেশি তাই কেনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় তোমার বাবার কাছে ইলিশ মাছের চাহিদা নেই বা কমে গেছে। আবার একদিন তোমার বাবা হঠাৎ দুটি ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ি এলেন এবং হাসিমুখে বললেন আজকে ইলিশ মাছের দাম কম, তাই দুটি মাছ নিয়ে এলাম। অর্থাৎ চাহিদার সাথে দামের একটি ঘনিষ্ঠ বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে।

অতএব চাহিদা বিধি বা সূত্র বলতে আমরা বুঝি "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে।" [দাম (↑) - চাহিদা (↓) আবার দাম (↓) - চাহিদা (↑)]। দামের সাথে চাহিদার এরূপ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি। অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত হলে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হয় না এবং চাহিদা রেখাটি ডানে বা বামে স্থানান্তরিত হয়।

চাহিদাসূচি থেকে চাহিদারেখা অঙ্কন

চাহিদা বিধিতে আমরা দেখেছি দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে, আবার দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। এ ধারণাটি যখন সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে চাহিদাসূচি বলে। অতএব, বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয়, তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদাসূচি বা চাহিদা তালিকা বলে।

চাহিদাসূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৮.০০	৪
৬.০০	৮
৪.০০	১২
২.০০	১৬

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ৮ টাকা হলে একজন ভোক্তা ৪ একক দ্রব্য ক্রয় করে। দাম কমে ৬ টাকা, ৪ টাকা ও ২ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে ৮ একক, ১২ একক ও ১৬ একক হয়। এভাবে চাহিদা সূচির মাধ্যমে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

উপরের এ চাহিদাসূচি থেকে আমরা চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারি।

চাহিদারেখা

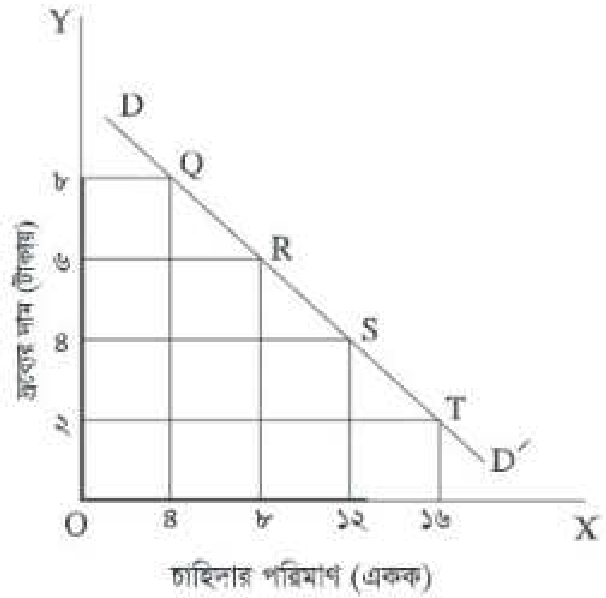

পূর্বের পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে বা OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে বা OY অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪ একক। এখন OY অক্ষের ৮ সূচক এবং OX অক্ষের ৪ সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর Q বিন্দুতে মিলিত হয়। এভাবে R, S ও T বিন্দুতে যথাক্রমে ৬ টাকায় ৮ একক, ৪ টাকায় ১২ একক এবং ২ টাকায় ১৬ একক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার Q, R, S ও T বিন্দুগুলোকে যোগ করলে আমরা DD´ রেখা পাব। এই DD´ রেখাই চাহিদারেখা। DD´ চাহিদারেখার বিন্দুগুলো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করছে।

এভাবে আমরা চাহিদা বিধি অনুযায়ী চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারি। উল্লেখ্য, আমরা এখানে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করেছি।

কাজ : চাহিদাসূচি ও চাহিদারেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ করো।

৩.৫ বাজার চাহিদারেখা অঙ্কন

একজন ব্যক্তির চাহিদা সূচি থেকে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়। তেমনি বাজার চাহিদা রেখাও অঙ্কন করা সম্ভব। বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা। আমরা বোঝার সুবিধার্থে ধরে নেব একটি বাজারে ভোক্তার সংখ্যা হলো দুজন। নিচে দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখার মাধ্যমে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো:

বাজার চাহিদাসূচি

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা (Q_1) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	২নং ভোক্তার চাহিদা (Q_2) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	বাজার চাহিদা (Q) ($Q=Q_1+Q_2$) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)
৬.০০	৫	১০	১৫
৪.০০	১০	১৫	২৫
২.০০	১৫	২০	৩৫

উপরের সূচিতে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদা দেখানো হয়েছে। এ দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে কীভাবে বাজার চাহিদাসূচি তৈরি করা হয়েছে, তা দেখানো হলো।

বাজারে কোনো দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ব্যক্তি যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত থাকে তার সমষ্টিকে যে চাহিদারেখার সাহায্যে দেখানো হয়, তাকে বলা হয় বাজার চাহিদারেখা।

১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদারেখা পাশাপাশি যোগ করে বাজার চাহিদারেখা অঙ্কন করা যায়।

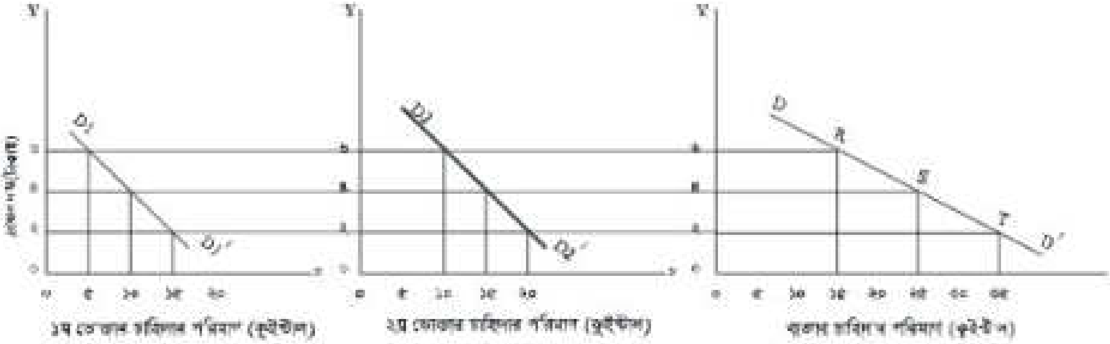

চিত্র: ১ম, ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত ও বাজার চাহিদা রেখা

উপরের রেখাচিত্রে বাজারের ১ম ও ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা হলো যথাক্রমে D_1D_1' ও D_2D_2' । দ্রব্যের দাম যখন ৬ টাকা তখন ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কুইন্টাল ও ১০ কুইন্টাল এবং বাজার চাহিদা হবে ১৫ কুইন্টাল (৫ কুইন্টাল + ১০ কুইন্টাল); যা বাজার চাহিদা রেখায় R বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। দাম কমে ৪ টাকা ও ২ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টি বাজার চাহিদা হবে যথাক্রমে ২৫ কুইন্টাল (১০ কুইন্টাল + ১৫ কুইন্টাল) এবং ৩৫ কুইন্টাল (১৫ কুইন্টাল + ২০ কুইন্টাল); যা বাজার চাহিদা রেখায় S ও T বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এবার আমরা R, S ও T বিন্দু যোগ করে DD' চাহিদা রেখা অঙ্কন করি। এটি বাজার চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত। বাজার চাহিদা রেখাটি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলির আনুভূমিক যোগফল। এ কারণে বাজার চাহিদা রেখাটি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলির তুলনায় বেশি ঢালু (Flatter)।

৩.৬ জোগান (Supply)

বাজারে গেলে আমরা দেখবো বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে বিক্রেতাগণ দোকান সাজিয়ে রেখেছেন। তবে আমরা এটাকেই জোগান বা সরবরাহ বলবো না। অর্থনীতিতে জোগান বলতে একজন বিক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে জোগান বলে। উল্লেখ্য, একটি দ্রব্য, একটি নির্দিষ্ট সময় ও একটি নির্দিষ্ট দাম এখানে বিবেচ্য। অতএব, উৎপাদক বা বিক্রেতা বিভিন্ন দামে দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাকেই অর্থনীতিতে জোগান (Supply) বলে।

জোগানবিধি

আমরা প্রতিনিয়ত বাজারে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। একজন বিক্রেতা কখন তার দ্রব্যটি বিক্রয় করতে আগ্রহী হবেন? অবশ্যই ঐ দ্রব্যের দাম যখন বাজারে সবচেয়ে বেশি, তখনই একজন বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রয় করতে চাইবেন। ধরি, আলুর কেজি যখন ১৫ টাকা, তখন বিক্রেতা ২ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করে। দাম বেড়ে ২০ টাকা কেজি হলে বিক্রেতা বেশি পরিমাণে আলু সরবরাহ করতে চায়। মনে করি, তখন সরবরাহ হবে ৩০ কুইন্টাল। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমার সাথে সাথে দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ কমে যায়। অতএব দাম ও জোগানের সম্পর্ক সমমুখী।

দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, জোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (যেমন, উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত), দাম বৃদ্ধি পেলে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে জোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ দামের সঙ্গে জোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে জোগান বিধি বলে। অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত হলে জোগান বিধিটি কার্যকর হয়না এবং জোগান রেখাটি ডানে বা বামে স্থানান্তরিত হয়।

জোগানসূচি থেকে জোগানরেখা অঙ্কন

দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে জোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে জোগানের এ সমমুখী পরিবর্তনকে জোগান সূচিতে দেখানো যায়।

জোগানসূচির একদিকে দ্রব্যের দাম এবং অন্যদিকে দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ দেখানো হলো।

জোগানসূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	জোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
১০.০০	১০
২০.০০	২০
৩০.০০	৩০
৪০.০০	৪০

সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি কুইন্টালের দাম ১০ টাকা হলে তার জোগান হয় ১০ কুইন্টাল। দাম বেড়ে ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা হলে জোগানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল ও ৪০ কুইন্টাল। এভাবে জোগান সূচিতে জোগান বিধি প্রতিফলিত হয়।

জোগানরেখা

কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে জোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে জোগানের পরিমাণের এ সমমুখী পরিবর্তনকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়, তখন তাকে জোগান রেখা বলে।

জোগানসূচি থেকে কীভাবে জোগানরেখা অঙ্কন করা যায় তা নিচে দেখানো হলো।

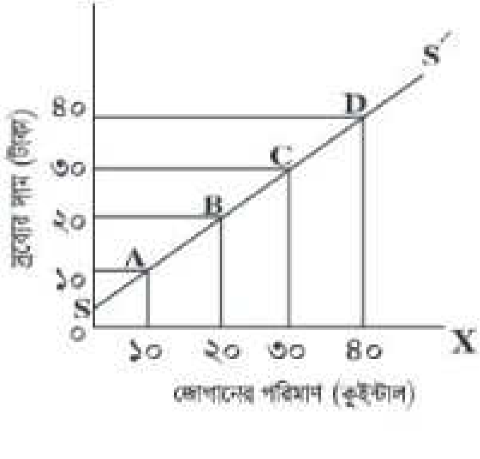

চিত্রে OX বা ভূমি অক্ষে দ্রব্যের জোগান বা পরিমাণ ও OY বা লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হলো। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা, তখন দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল; যা মিলিত হয়েছে A বিন্দুতে। এভাবে দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা, তখন দ্রব্যের জোগান যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল এবং ৪০ কুইন্টাল। বিন্দুগুলো মিলিত হয়েছে যথাক্রমে B, C এবং D বিন্দুতে। এবার আমরা A, B, C ও D বিন্দুগুলোকে যোগ করলে পাব SS′ রেখা। এটিই জোগান রেখা।

৩.৭ বাজার জোগানরেখা অঙ্কন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের জোগান দেন, তাকে ব্যক্তিগত জোগান বলে। অন্যদিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বাজারের সব বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য জোগান দেন, তাকে বাজার জোগান বলে। সব বিক্রেতার ব্যক্তিগত জোগানসূচি যোগ করে বাজার জোগানসূচি তৈরি করা যায়। নিচে একটি সংক্ষিপ্ত ও সরলীকৃত বাজার জোগানসূচি দেখানো হলো-

বাজার জোগানসূচি

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম বিক্রেতার জোগান (S_1) (কুইন্টাল)	২ বিক্রেতার জোগান (S_2) (কুইন্টাল)	বাজার জোগান (S) $S=S_1+S_2$ (কুইন্টাল)
১০.০০	১০০	৫০	১৫০
১৫.০০	১৫০	৭৫	২২৫
২০.০০	২০০	১০০	৩০০

উপরের সূচিতে ১ম ও ২য় বিক্রেতার দ্রব্যের জোগান দেখানো হয়েছে। এ দুজন বিক্রেতার জোগানকৃত দ্রব্য দিয়ে কীভাবে বাজারে জোগান রেখা অঙ্কন করা যায়, তা নিচে দেখানো হলো-

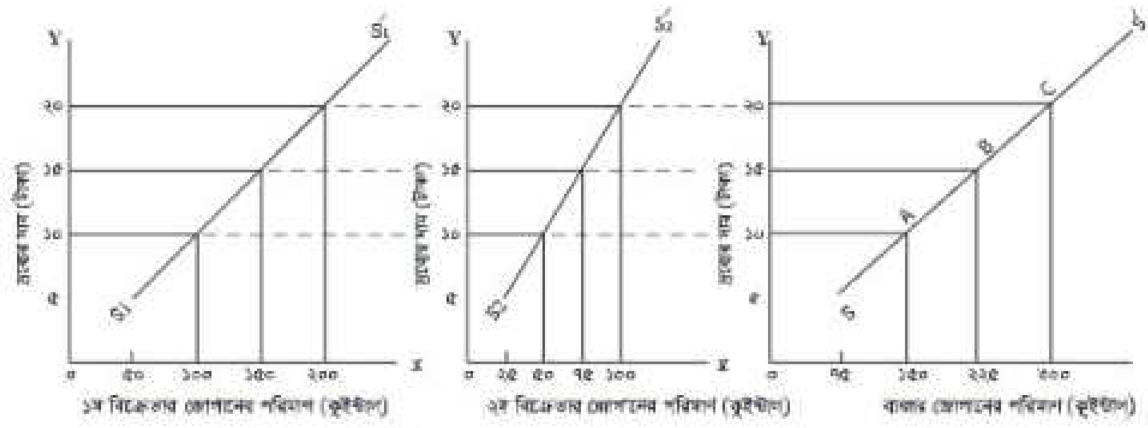

চিত্র : বাজার জোগানরেখা

উপরের রেখাচিত্রে ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত জোগানরেখা হলো যথাক্রমে S_1S_1' ও S_2S_2'। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা, তখন ১ম ও ২য় বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ কুইন্টাল এবং বাজার জোগান হবে ১৫০ কুইন্টাল (১০০+৫০); যা চিত্রে A বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম বেড়ে ১৫ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত জোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১৫০ ও ৭৫ কুইন্টাল

এবং বাজার জোগান হবে ২২৫ কুইন্টাল (১৫০+৭৫); যা বাজার জোগান রেখায় B বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম আরও বেড়ে ২০ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার জোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ কুইন্টাল। বাজার জোগানের পরিমাণ হবে ৩০০ কুইন্টাল (২০০+১০০)। যা বাজার জোগান রেখায় C বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এবার A, B এবং C বিন্দু যোগ করে আমরা SS′ রেখা অঙ্কন করি; যা বাজার জোগানরেখা হিসেবে পরিচিত। বাজার জোগানরেখাটি ব্যক্তিগত জোগানরেখাগুলির আনুভূমিক যোগফল। এ কারণে বাজার জোগানরেখাটি ব্যক্তিগত জোগান রেখাগুলির তুলনায় বেশি ঢালু (flatter)।

কাজ : জোগানসূচি ও জোগানরেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ কর।

৩.৮ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

বাজারের একটি সাধারণ দৃশ্য হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে দর-কষাকষি করা। ক্রেতা চেষ্টা করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে। আবার, বিক্রেতা চেষ্টা করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে। ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয়, যেখানে চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান। যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও জোগান সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয়, তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

নিচে একটি সমন্বিত চাহিদা ও জোগানসূচির মাধ্যমে বাজারের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ ব্যাখ্যা করা হলো:

সারণী : বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

দ্রব্যের দাম (টাকা)	দ্রব্যের চাহিদা (একক)	দ্রব্যের জোগান (একক)
৫	৬	২
১০	৪	৪
১৫	২	৬

উপরের সারণী থেকে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন বাজার চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ সমান। অর্থাৎ এখানে ভারসাম্য দাম হচ্ছে ১০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ হচ্ছে ৪ একক। নিচের চিত্রের মাধ্যমেও বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়।

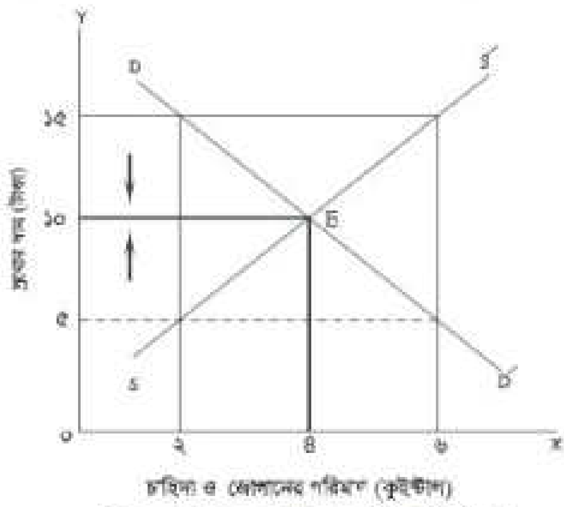

চিত্র : ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

চিত্রে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম যখন ৫ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৬ একক এবং জোগানের পরিমাণ ২ একক। এক্ষেত্রে চাহিদা > জোগান হওয়ায় দ্রব্যটির দাম বাড়বে।

অন্যদিকে দ্রব্যটির দাম যখন ১৫ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হলো ২ একক এবং জোগানের পরিমাণ হলো ৬ একক, এক্ষেত্রে জোগান > চাহিদা হওয়ায় দ্রব্যটির দাম কমবে।

কিন্তু দ্রব্যটির দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ ৪ একক, যা পরস্পর সমান। এক্ষেত্রে চাহিদা = জোগান এবং বাজার স্থিতিশীল হবে, যাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

চিত্রে বাজার চাহিদা ও জোগান রেখার ছেদ বিন্দু E হচ্ছে বাজার ভারসাম্য বিন্দু। অতএব, ভারসাম্য দাম হলো ১০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো ৪ একক।

কাজ: পোস্টার কাগজে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের চিত্রটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উপযোগ কী?

২. ভোগ ও ভোক্তা বলতে কী বোঝায়?

৩. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বোঝায়?

৪. চাহিদার সংজ্ঞা দাও। চাহিদার বিধিটি কী?

৫. বাজার চাহিদা রেখা কী?

৬. জোগান বিধিটি কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করো।

২. একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো।

৩. দুইজন ভোক্তার কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে একটি বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করো।

৪. একটি কাল্পনিক জোগান সূচি থেকে জোগান রেখা অঙ্কন করো।

৫. চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে চাহিদার শর্ত কয়টি?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২. বাজার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নিচের কোন শর্তটি আবশ্যক?

ক. যে বিন্দুতে চাহিদা = জোগান খ. যে বিন্দুতে চাহিদা > জোগান

গ. যে বিন্দুতে জোগান > চাহিদা ঘ. জোগান দাম < চাহিদা দাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাহসীন স্কুলে গিয়ে পেয়ারা কিনে খেলো। তার ভোগকৃত পেয়ারার উপযোগ সূচি নিচে দেওয়া হলো-

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১	৫	৫
২	৯	৪
৩	১২	

৩. তাহসীনের ৩য় পেয়ারার প্রান্তিক উপযোগ কত?

ক. ৫ টাকা খ. ৪ টাকা

গ. ৩ টাকা ঘ. ২ টাকা

৪. তাহসীনের উক্ত আচরণে-

i. স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে

ii. পেয়ারার প্রতি আকর্ষণ অপরিবর্তিত রয়েছে

iii. পেয়ারার প্রতি প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগয়ে কমেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 'ক' ও 'খ' ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দামে 'X' দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেওয়া হলো-

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	'ক' ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল)	'খ' ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল)
২০	৫	৭
১৫	১০	১১
১০	১৫	১৫

ক. উপযোগ কাকে বলে?

খ. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে একটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

গ. 'X' দ্রব্যের চাহিদা সূচি থেকে 'ক' ব্যক্তির চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'X' দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ক ব্যক্তির চাহিদা রেখার সাথে তুলনা করো।

২. সুজন বাজারে গিয়ে দেখে আলুর দাম প্রতি কেজি ২৫ টাকা। সে ১২০ কেজি আলু কিনে, কিন্তু করিম একই দামে ১৬০ কেজি আলু বিক্রি করতে চায়। পরদিন আলুর দাম কমে ২০ টাকা হওয়াতে সুজন ১৪০ কেজি আলু কেনে এবং তখন করিম ১৪০ কেজি আলু বিক্রি করে।

ক. চাহিদা কাকে বলে?

খ. চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করো।

গ. করিমের আলুর জোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে করো সুজন ও করিম আলুর বাজারে ভারসাম্য দামে পৌঁছাতে পেরেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়
উৎপাদন ও সংগঠন
Production & Organisation

শরবত একটি উৎপাদিত দ্রব্য। শরবত উৎপাদন করতে পানি, চিনি, লেবু ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। উপকরণ ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন এবং তা ভোগের মাধ্যমে উপযোগ বা তৃপ্তি সৃষ্টি করা যায়। উৎপাদন কাজটি করে থাকে সংগঠন। উৎপাদন করতে উপকরণ যেমন পানি, চিনি, লেবু লাগে, কীভাবে উৎপাদন করবে তার একটি পরিকল্পনা করতে হয় এবং উৎপাদন করার সময় বিভিন্ন জন বিভিন্ন কাজ করেন। যোগ্যতা অনুযায়ী এই কাজগুলো বণ্টন করতে হয়, উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজারে নিতে হয়। এ ধরনের কাজগুলো করে সংগঠন। যে ব্যক্তি সংগঠনের মূল দায়িত্ব পালন করেন, তাকে বলা হয় উদ্যোক্তা। সংগঠন বা উদ্যোক্তা দক্ষ না হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- উৎপাদনের সাথে উৎপাদকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উৎপাদনের উপকরণসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- সংগঠন ও এর বিকাশ আলোচনা করতে পারব;
- গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারব;
- প্রকাশ্য ব্যয় ও অপ্রকাশ্য ব্যয় চিহ্নিত করতে পারব;
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হব এবং
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারব।

৪.১ উৎপাদন ও উৎপাদক (Production and Producer)

উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। আবার উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন–আটা, লবণ, পানি, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। রুটি একটি উৎপাদিত নতুন দ্রব্য। রুটি খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি বা তৃপ্তি পাই। অর্থাৎ রুটি তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা টাকা বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে রুটি পেতে পারি। অর্থাৎ নতুন দ্রব্য রুটির বিনিময় মূল্য আছে। ব্যবসা করার জন্য রুটি বানানো হলে অনেক সময় রুটিগুলো বাজারে নিয়ে যেতে হয়। উপকরণ সংগ্রহ থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবকাজ তদারকি করে সংগঠন বা সংগঠন পরিচালক উদ্যোক্তা। যেমন: কী উপকরণ লাগবে, কোথা থেকে উপকরণ আনবে, কে আনবে, কে লবণ, আটা, পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করবে, কে রুটি বেলবে, কে সেঁকবে, কে বাজারে নেবে, কত দামে বিক্রয় করবে, এই সবই দেখে সংগঠন বা সংগঠন পরিচালক উদ্যোক্তা। সবকিছু সংগঠন দক্ষতার সঙ্গে তদারকি না করতে পারলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে না। একই ব্যক্তি সংগঠক এবং উৎপাদক হতে পারে। যেমন: যে ছোট/মাঝারি কৃষক নিজে নিজের জমিতে ফসল উৎপাদন করছেন, তিনি একই সাথে উৎপাদক এবং সংগঠক। কিন্তু যে কারখানার মালিক ম্যানেজার হিসেবে শ্রমিকদের দ্বারা কারখানা চালাচ্ছেন, তিনি সংগঠক হলেও উৎপাদক নন। আবার যে কারখানার মালিক ম্যানেজার রেখে শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করাচ্ছেন, তিনি সংগঠকও নন, উৎপাদকও নন তিনি নিছক মালিক। আবার যে মালিক নিজে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করছেন এবং অন্য উৎপাদকদের তত্ত্বাবধান করছেন, তিনি হচ্ছেন একই সঙ্গে মালিক–উৎপাদক–সংগঠক।

উৎপাদনে উপযোগ সৃষ্টি পাঁচ ভাগে দেখানো যায়। যেমন-

১. রূপগত **উপযোগ** : দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উপযোগ বলে। যেমন, কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হলো রূপগত উৎপাদন।

২. স্থানগত **উপযোগ** : কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন, বনের কাঠ সাধারণত বনের আশপাশের লোকজন খড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। শহরে আনলে মানুষ এই কাঠ দিয়ে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বানাতে পারে। ফলে এর উপযোগ বাড়ে। আবার বনে ফুলের তেমন কদর নেই। কিন্তু সেই ফুলসহ গাছ শহরের বাড়ির আঙিনায় রাখলে এর কদর বাড়ে অর্থাৎ উপযোগ বাড়ে।

৩. সময়গত **উপযোগ** : কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন, পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়। এখানে ধানের উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি না পেলেও তার উপযোগ বা দাম বর্ধিত হবে।

৪. **সেবাগত উপযোগ** : মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে বা বৃদ্ধি করে।

৫. **মালিকানাগত উপযোগ** : কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন, অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে আরো ভালোভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারে।

উপরে তোমরা উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টির ধারণা পেলে। এবার তোমরা জানতে পারবে এই উৎপাদনের কাজটি কে বা কারা করে। রমজান আলী একজন কৃষক। তাঁর তিন বিঘা কৃষিজমি রয়েছে। এই জমিতে রমজান নিজেই এক ঋতুতে ধান উৎপাদন করেন, অন্য ঋতুতে গম উৎপাদন করেন। ধান ও গম উৎপাদনের মাঝখানে সবজি চাষ করেন। এই সব উৎপাদনের জন্য উপকরণ হিসাবে বীজ, সার, পানি, কীটনাশক, ধান-গম কাটা ও মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই সব কাজে পরিবারের লোকেরাও তাকে সহযোগিতা করে।

কাজ : (১) নিচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট উপযোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করো।

(ক) মাছের পুকুর, (খ) সৈনিকের কাজ, (গ) পিতামাতার আদর-স্নেহ, (ঘ) বাবার সম্পত্তি সন্তানকে প্রদান (ঙ) লোহা পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি, (চ) গম থেকে আটা, (ছ) আখ থেকে চিনি, (জ) ধান থেকে চাল, চাল থেকে পিঠা, (ঝ) গ্রামের কলা, ফলমূল, সবজি শহরে আনা (ঞ) অগ্রহায়ণ মাসের আলু আষাঢ় মাসে বিক্রি ইত্যাদি।

কাজ : (২) রমজান আলী একজন মালিক, উৎপাদক না সংগঠক তা উল্লেখ করো।

৪.২ উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production)

মনে করো তোমার এলাকায় গম, আলু, কলা, ধান, ইত্যাদি কৃষিপণ্য এবং কাপড়, বিস্কুট, প্লাস্টিক ইত্যাদি শিল্পপণ্য উৎপাদিত হয়। এই কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে অনেকগুলো উপকরণের প্রয়োজন হয়। কৃষকের ধান উৎপাদন করতে জমি, বীজ, সার, লাঙল, সেচ, শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পপণ্যের জন্য কারখানা, বিল্ডিং, কাপড়, সুতা, মেশিন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ময়দা, চিনি, তৈল, শ্রমিক লাগে। এসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে আবার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনঃ মাটি, মাটির উর্বরতা শক্তি, আলো-বাতাস, পরিবেশ, খনিজ দ্রব্য, সূর্য কিরণ, পানি, আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। এখানে যেসব দ্রব্যের কথা বলা হলো, এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ। অতএব, কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে।

উৎপাদনের উপকরণ মূলত চার ধরনের হয়। যেমন: ১. ভূমি (Land), ২. শ্রম (Labour), ৩. মূলধন (Capital) এবং ৪. সংগঠন (Organisation)।

১. **ভূমি :** উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। যেমন, জমি, মাটি, মাটির উর্বরতা শক্তি, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্য কিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত।

২. **শ্রম :** উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। উৎপাদনে চাষি, জেলে, কামার, কুমার, তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। আবার অফিস-আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয়। একইভাবে শিক্ষকের শিক্ষাদান, ডাক্তারের সেবা ও উকিলের পরামর্শ এক ধরনের শ্রম।

৩. **মূলধন :** মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। যেমন: যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি।

৪. **সংগঠন :** সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলে। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ পরিচালনাকে ব্যবস্থাপনাও বলা হয়। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন, তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন: কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম, মূলধন একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা – এসবই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন–এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি। আবার উন্নত শিল্পপ্রধান দেশ যেমন: যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি।

কাজ : (১) দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপকরণসমূহ কী কী হতে পারে?

দেশের নাম	উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ	....
জাপান শিল্পনির্ভর দেশ	....

কাজ : (২) উৎপাদন খাতে অধিক গুরুত্ব অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজাও।	
উৎপাদন খাত	**অধিক গুরুত্বের ভিত্তিতে উপকরণগুলো হচ্ছে**
কৃষি	....
শিল্প	....

৪.৩ সংগঠন ও এর বিকাশ (Organisation and its Development)

আয়েশা বেগম তাঁর সংসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে বাড়িতে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। এই খামার থেকে সারা বছরই কমবেশি ডিম উৎপাদিত হয়। এক বছর পর সরকারি মাছের খামার দেখতে যান আয়েশা এবং এর পর থেকে তাঁর মাথায় হাঁস-মুরগির খামারের পাশাপাশি মাছ চাষ করার আগ্রহ জাগে। এক বছরে হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রির নিট আয় বিশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে পুকুর করে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ শুরু করেন। দুটি খামারে নতুন করে কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ দেন। হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রি এবং এক বছর পরে পুকুরের মাছ বিক্রি শুরু হলে আয়েশার উপার্জন বাড়তে থাকে। তিনজন সন্তানের পড়াশোনার খরচ এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় খরচ মিটিয়ে আয়েশার সঞ্চয়ও বাড়তে থাকে। আয়েশার মাছ ও হাঁস-মুরগির খামারের কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর স্বামী রহমত আলী শহরের চাকরি ত্যাগ করে গ্রামে স্ত্রীর খামারে যোগ দেন। উভয়ের প্রচেষ্টায় তাঁরা বেশ কিছু জমি, হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। ১২ জন নারী-পুরুষ শ্রমিকও নিয়োগ করেন। প্রত্যেক শ্রমিকের কাজও বুঝিয়ে দেন তাঁরা। আয়েশা এবং রহমত পালাক্রমে শ্রমিক কর্মচারী এবং খামারসমূহ তদারক করেন। ডিম ও মাছ বাজারজাত করে বেচা-কেনার ব্যবস্থাও করেন তাঁরা। তাদের সাফল্য দেখে গ্রামের অনেকে তাঁদের অনুসরণ করে গ্রাম ও এলাকাজুড়ে হাঁস-মুরগির খামার এবং মাছ চাষ শুরু করেন। ডিম ও মাছ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকার নিয়মিত আসে আয়েশার গ্রামে। কয়েক বছরে এলাকাটি কৃষি, হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষাবাদ করে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এলাকায় এখন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগি ও মাছ উৎপাদন করা যায়।

আমরা কি বলতে পারি যে আয়েশা বেগম একজন সংগঠক? তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা কি বিকাশ লাভ করেছে?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে সংগঠন বলে। সত্যিকার অর্থে সংগঠন ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই কার্যসম্পাদনে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন। সুতরাং সংগঠন হচ্ছে ব্যবসায়ের ভিত্তি।

সংগঠনের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে ধরে রাখা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি সাংগঠনিক কাঠামোর কাজ। তাছাড়া বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন, নিয়ম-শৃঙ্খলা গড়ে তোলা ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্গত। ব্যবসায়ের আয়তন, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্পের প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের দক্ষতা প্রভৃতির উপর ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভরশীল। সংগঠনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সম্মিলিত উৎপাদন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎপাদনের বা আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। তা না হলে কোনো সামাজিক সংগঠনই টেকসই হয় না।

ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও শাখার কাজকর্ম নির্দিষ্ট করে ভারপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের পদগুলো ক্রমানুসারে সাজালে তা হতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কাঠামোর যে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তাকে সংগঠনের চিত্র বলে। সংগঠন ব্যবস্থাপনা যত সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে ব্যবসায়ের সাফল্য তত বেশি হবে। সুতরাং সংগঠনই হলো ব্যবসায়ের বা যেকোনো সামাজিক উৎপাদনের মৌলিক ও প্রধান বিষয়।

একটি ভালো সংগঠনের কতগুলো প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য থাকে। তা হচ্ছে–

১. **ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি :** সংগঠনের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায়ের সাংগঠনিক রূপ তৈরি করতে হয়। এই উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ, কোনটি স্বল্পমেয়াদি এবং কোনটি দীর্ঘমেয়াদি তা নির্ধারণ করে নিতে হয়।

২. **ব্যবসায়ের কার্যাবলি নির্ধারণ :** ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঠিকমতো নির্ধারণ করার পর ব্যবসায়ের সমগ্র কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি। সে জন্য প্রয়োজন হয় হিসাবরক্ষণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, পণ্য মজুদ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

৩. **কার্যাবলি বিভাগ :** কার্যাবলি বিশ্লেষণের পর কাজের ধরন ও উদ্দেশ্যের মিল অনুযায়ী কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একই বিভাগের সহায়ক কাজগুলোকে আবার উপবিভাগে ভাগ

করা হয়। যেমন, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি। অনেক সময় কোনো কোনো ব্যবসা আঞ্চলিক ভিত্তিতেও ভাগ করা হয়। কয়েকটি শাখা একত্রে আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে গণ্য হয়।

৪. **কর্তব্য বন্টন :** ব্যবসায়ের প্রতিটি কর্মীর উপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করা হয়। অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রতিটি বিভাগে ও উপবিভাগের প্রতিটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট কর্তব্য স্থির করা হয় এবং যে কর্মী যে কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ, তাকে সেই কাজই দেওয়া হয়।

৫. **অধিকার ও ভার বন্টন :** ভার অর্পণ বলতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে বোঝায়। প্রতিটি কর্মীকে স্বাধীনভাবে, নির্বিঘ্নে এবং যথাযথভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার একাংশ তাঁর অধস্তন কর্মীকে অর্পণ করেন। আবার অধস্তন কর্মী তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট কাজের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন। উপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে উপরে এই দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সংগঠন সফল হয়।

কাজ : সাংগঠনিক কাজের একটি তালিকা তৈরি করো।

৪.৪ মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন (Total, Average and Marginal Production)

কমল বাবু তাঁর এক বিঘা জমিতে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬০০ কুইন্টাল গম উৎপাদন করেন। এখানে গড়ে শ্রমিক প্রতি ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। শ্রমিক প্রতি এই ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে গড় উৎপাদন বলে। পরের মৌসুমে ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। এখানে গত বছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৫ কুইন্টাল। এই ৬৫৫ − ৬০০ = ৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অর্থাৎ অতিরিক্ত একজন (১১তম) শ্রমিক নিয়োগ করায় উৎপাদন বাড়ল ৫৫ কুইন্টাল। ১১তম শ্রমিক হলো প্রান্তিক শ্রমিক। সুতরাং প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন হলো ৫৫ কুইন্টাল। তাহলে এখানে ৬০০ কুইন্টাল হচ্ছে ১০ জন শ্রমিকদের মোট উৎপাদন, ৬০ কুইন্টাল হচ্ছে শ্রমিকপ্রতি গড় উৎপাদন এবং ৫৫ কুইন্টাল হচ্ছে ১১তম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। মোট, গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

৪.৫ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। একপর্যায়ে উপকরণটি আরো বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে।

সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে উপকরণ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়তে পারে। মনে করি আমাদের ভূমি ও শ্রম দুটি উপকরণ আছে। ভূমির পরিমাণ স্থির। প্রথমে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রান্তিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকে। এ কারণে প্রান্তিক শ্রমের বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত বেশি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে

থাকলে একটি পর্যায়ে এসে ভূমির তুলনায় শ্রম অনেক বেশি হওয়ায় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। এর কারণ হলো অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করায় প্রতি একক শ্রমের জন্য ভূমি কম থাকে। ফলে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একে বলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। নিম্নের সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা যায়।

সূচি : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি

ভূমির পরিমাণ (স্থির)	শ্রম উপকরণ শ্রমিকের শ্রমঘণ্টা	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)	গড় উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ হেক্টর	১	A	১০	১০	১০
১ হেক্টর	২	B	২৪	১৪	১২
১ হেক্টর	৩	C	৩৬	১২	১২
১ হেক্টর	৪	D	৪৬	১০	১১.৫
১ হেক্টর	৫	E	৫৪	৮	১০.৮
১ হেক্টর	৬	F	৬০	৬	১০
১ হেক্টর	৭	G	৬০	০	৮.৫৭
১ হেক্টর	৮	H	৫৬	-৪	৭

উক্ত সূচি থেকে মোট উৎপাদন, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়।

মোট উৎপাদন : একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তার মোট পরিমাণকে মোট উৎপাদন বলে। এখানে ভূমির পরিমাণ স্থির ধরে শুধুমাত্র শ্রম উপকরণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, তাকে মোট উৎপাদন বলে। উক্ত সারণি থেকে নিম্নোক্ত মোট উৎপাদন রেখাটি অঙ্কণ করা যায়।

মোট উৎপাদন : বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে মোট উৎপাদন বলে।

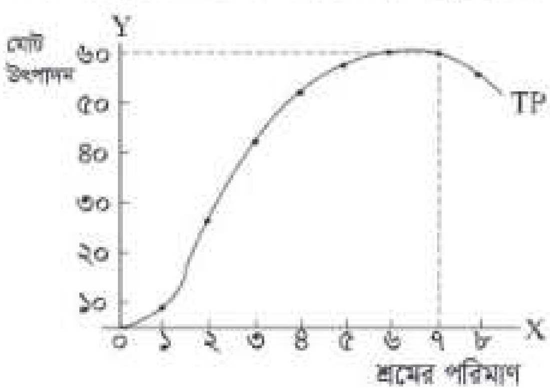

উক্ত চিত্র থেকে দেখা যায়, শ্রমের পরিমাণ যখন ৭ শ্রমঘণ্টা তখন মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়। অর্থাৎ ৬০ কুইন্টাল এরপর শ্রমের পরিমাণ আরো বাড়ালে মোট উৎপাদন কমতে থাকে।

গড় উৎপাদন : মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়। (এখানে আমরা অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে উপকরণ হিসেবে শ্রমকে নিয়েছি। অন্য উপকরণ নিয়েও গড় উৎপাদন বের করা যায়)।

$$\text{গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

প্রান্তিক উৎপাদন : এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের (অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন) ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। শ্রম ব্যবহার করলে শ্রমের বা মূলধন ব্যবহার করলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বলব। অর্থাৎ এক একক মূলধন বা এক একক শ্রম বা একজন শ্রমিক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। ৫০ নং পৃষ্ঠার সূচি থেকে দেখা যায় শ্রম উপকরণ ১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ শ্রমঘণ্টা হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ থেকে ২৪ কুইন্টাল হয়। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হচ্ছে (২৪−১০) = ১৪ কুইন্টাল। একইভাবে শ্রম উপকরণ নিয়োগ ৩ শ্রমঘণ্টা তে বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩৬ কুইন্টাল। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হলো (৩৬−২৪) = ১২ কুইন্টাল।

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক

উক্ত সারণির ভিত্তিতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়–

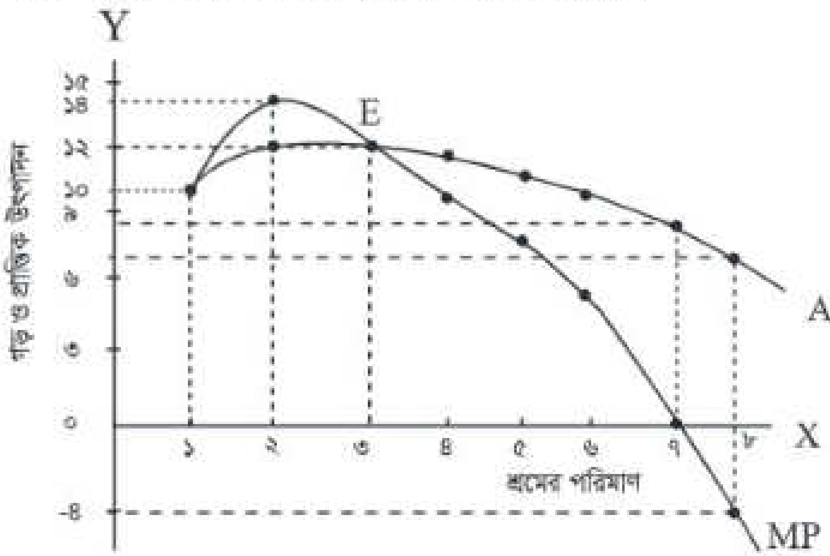

চিত্রে OX অক্ষে শ্রমের পরিমাণ এবং OY অক্ষে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করে। AP গড় উৎপাদন রেখা এবং MP প্রান্তিক উৎপাদন রেখা নির্দেশ করে। নিম্নে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো :

১. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে, তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এ জন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদনের উপরে থাকে। চিত্রে শ্রমের নিয়োগ ২ শ্রমঘণ্টা হলে প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি।

২. প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের উপরে থাকে এবং কমতে থাকে, তখন গড় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এ অবস্থায় কিছুদুর পর্যন্ত গড় উৎপাদন রেখা প্রান্তিক উৎপাদন রেখার নিচে থাকে এবং বাড়তে থাকে। চিত্রে শ্রমের নিয়োগ ৫ শ্রমঘণ্টা হলে গড় উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হলেও তা কমছে। কিন্তু শ্রমের ব্যবহার ৩ শ্রমঘণ্টা হলে প্রান্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন পরস্পর সমান হয়েছে। এরপর থেকে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম থাকে।

৩. গড় উৎপাদন যখন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা তখন গড় উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে। অর্থাৎ গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। চিত্রে শ্রম উপকরণ ৩ শ্রমঘণ্টা নিয়োগ স্তরে E বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান।

৪.৬ উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)

রাজশাহীর নুরু মিয়া ২ একর জমিতে লিচু বাগান করেছেন। বাগানে প্রায় ১০০টি লিচু গাছ আছে। এ বছর বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বাবদ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। লিচুর ফলনও ভালো হয়। নুরু মিয়া ও তার ছেলে ঘুম ও আরাম ত্যাগ করে বাদুড় ও অন্যান্য পাখির উপদ্রব থেকে বাগানকে রক্ষা করেন। এই লিচু বাগানের জন্য দু-ধরনের খরচ হয়। ১. উপকরণ বাবদ ব্যয় অর্থাৎ আর্থিক উৎপাদন ব্যয় এবং ২. ঘুম ও আরাম ত্যাগ অর্থাৎ মানবিক কষ্ট। প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় পরিমাপ করতে হলে এই দুই ধরনের ব্যয়কেই বিবেচনায় নিতে হবে। এদের সমষ্টিকে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

৪.৭ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় (Explicit and Implicit Cost)

কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ বা শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন, এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। যেমন, উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে কর্মরত মানুষের বেতন ও ভাতাদি, কাঁচামাল, মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের স্থির ব্যয় যেমন, বাড়ি ভাড়া, মূলধনের সুদ ইত্যাদি।

অপ্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্বনিয়োজিত সম্পদের খরচ যেমন, নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসাব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এ ক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অপ্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

৪.৮ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় (Personal and Social Cost)

উপরে আমরা আর্থিক উৎপাদন ব্যয়, প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা পেয়েছি। এবার আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় সম্পর্কে জানব।

কোনো ফার্ম বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সম্পদ বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরাসরি যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় এবং অপরাপর অপ্রকাশ্য ব্যয় করে এদের সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে। এককথায় উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তির সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের যোগফল হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যয়। উৎপাদন বা ভোগ করতে গেলে উৎপাদন বা ভোগ প্রক্রিয়ার বাইরে সমাজের নানা ব্যক্তি অনেক সময় পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে যে মোট অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই হলো সামাজিক ব্যয়।

যেমন, মটরগাড়ির ধোঁয়া শহর এলাকায় বসবাসরত মানুষের শারীরিক ক্ষতি করে। এ জন্য সমাজকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ যে পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয় তাকে সামাজিক ব্যয় বলে। সামাজিক ব্যয়ে ব্যক্তিগত ব্যয় প্রতিফলিত হলেও ব্যক্তিগত ব্যয়ে সামাজিক ব্যয় প্রতিফলিত না-ও হতে পারে। সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও তা সাধারণত ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

কাজ : একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ? দলগতভাবে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন ও উপকরণ বলতে কী বোঝায়?

২. কৃষি উৎপাদনে কয়েকটি উপকরণের নাম লেখো।

৩. সংগঠকের ধারণা দাও।

৪. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় কেন?

৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মূল কথাটি কী?

৬. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় কী? উদাহরণসহ ধারণা দাও।

৭. সামাজিক ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের পার্থক্য একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টির পাঁচটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

২. উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যাখ্যা করো।

৩. সংগঠনের বিকাশ কীভাবে হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৪. একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।

৫. মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৬. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২. কোন ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইতে থাকে না?

ক. স্থির ব্যয় খ. মোট ব্যয়

গ. প্রকাশ্য ব্যয় ঘ. অপ্রকাশ্য ব্যয়

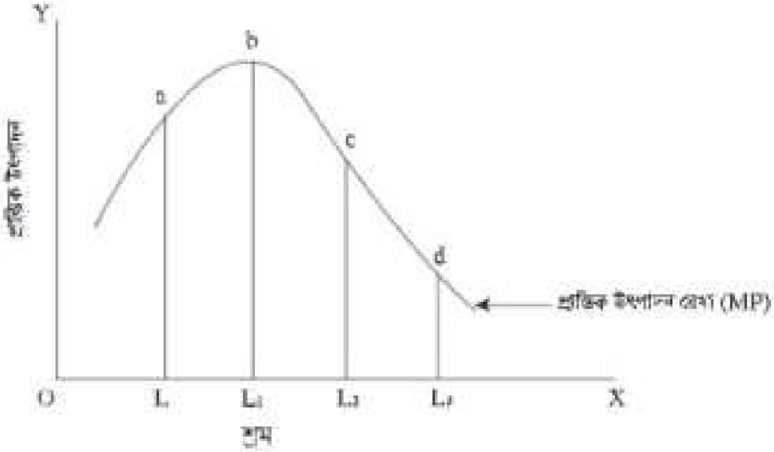

উপরের চিত্রটি দেখো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. সর্বোচ্চ প্রান্তিক উৎপাদন বিন্দুতে শ্রমের পরিমাণ কতটুকু?

ক. OL খ. OL_1

গ. OL_2 ঘ. OL_3

৪. প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখার bd অংশ থেকে বোঝা যায়–

i. উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে

ii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে

iii. উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবির একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর কয়েকটি আসবাবপত্রের দোকান আছে। তিনি ৩০ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ করেন। পণ্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে থাকেন। বাজারে তার আসবাবপত্রের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।

ক. শ্রম কাকে বলে?

খ. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি বলতে কী বোঝায়?

গ. কবিরের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কবিরকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. হোসেন আলী প্রথম বছর তাঁর নিজের এক একর জমিতে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক শ্রম নিয়োগ করে যে উৎপাদন পান তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো-

শ্রমিকের সংখ্যা	ধানের মোট উৎপাদন (কেজি)	ধানের মোট উৎপাদন মূল্য (প্রতি কেজি ২০ টাকা)	প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য
১	৫০	১০০০	১০০০
২	১০০	-	-
৩	১৩০	-	-
৪	১৫০	-	-

ক. মোট উৎপাদন কাকে বলে?

খ. ব্যক্তিগত ব্যয় বলতে কী বোঝায়?

গ. উপরের সারণিটি পূরণ করো।

ঘ. সারণিতে উপস্থাপিত বিষয়টি বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রেও প্রযোজ্য−মতামত দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

বাজার

Market

অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটি একটি পণ্যের চাহিদা, জোগান ও দাম নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বাজার ধারণাকে সময় মেয়াদ, পরিধি, দ্রব্যের প্রকৃতি এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বাজার রয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চিন্তাভাবনার ও আচরণের পরিবর্তন দেখা যায়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাজার বিকাশের ধারা ও প্রকারভেদের বর্ণনা করতে পারব;
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে বাজারব্যবস্থার ধরন চিহ্নিত করতে পারব;
- দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রভাব জানতে উৎসাহিত হব এবং
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরন চার্ট অঙ্কন করে দেখাতে পারব।

৫. বাজার (Market)

সুবেদ আলী একজন চাকরিজীবী। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য নিউ মার্কেট গেলেন। মাছ, তরিতরকারি, চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জিনিসের দাম যাচাই করে কিনলেন। বিক্রেতারা নগদ টাকার বিনিময়ে সুবেদ আলীর কাছে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করলেন। শ্রাবণী অনলাইনে একটি পোশাক ক্রয়ের অর্ডার দেয়। যথাসময়ে পোশাকটি পেয়ে দাম পরিশোধ করে। উপরের ঘটনা দুটিতে একটি পণ্যকে ঘিরে ক্রেতা ও বিক্রেতার যে সংযোগ ঘটে, তাকেই বাজার বলে।

অর্থনীতিতে বাজার বলতে শুধু বেচা-কেনার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না; বরং বাজার হলো একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা হয়। যেমন, অনলাইনে বেচা-কেনা, টেলিফোন ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে বেচা-কেনা। এ ধরনের বাজারে বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা বা বিশেষায়িত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। যেমন, টেলিফোনের মাধ্যমে সিমেন্ট কেনা-বেচা ইত্যাদি।

দ্রব্যের ধরন অনুযায়ী বাজার ভিন্ন হতে পারে। যেমন, পাটের বাজার, চালের বাজার, শ্রমের বাজার, চায়ের বাজার, স্বর্ণের বাজার, শেয়ারবাজার ইত্যাদি। আবার সময় মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে অতি অল্প সময়ের বাজার, স্বল্প সময়ের বাজার, দীর্ঘ সময়ের বাজার রয়েছে।

কাজ : বাজারের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করো।

৫.১ বাজারের বিকাশ ও প্রকারভেদ (Development and Types of Markets)

বাজারের ধারণায় যে মৌলিক বিষয়গুলো কাজ করে তা হলো চাহিদা, জোগান, সময় এবং দাম।

বাজারব্যবস্থায় একটি সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা দর-কষাকষি করে দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারণ করে বেচা-কেনা করে। এই ধারণার প্রেক্ষিতে সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের বাজার ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে এবং বাজার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে।

বিকশিত বাজার মূলত তিন ধরনের হয়

১. সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজার
↓
- অতি স্বল্প সময়ের বাজার
- স্বল্পকালীন বাজার
- দীর্ঘকালীন বাজার

২. পরিধি বা অঞ্চলের ভিত্তিতে
↓
- স্থানীয় বাজার
- জাতীয় বাজার
- আন্তর্জাতিক বাজার

৩. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার
↓
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfect Competitive Market)
- অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Imperfect Competitive Market)
  ↓
  ১. মনোপলি/একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)
  ২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competitive Market)
  ৩. অলিগোপলি বাজার (Oligopoly Market)

কাজ: প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি করো।

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের উৎপত্তি বিভিন্ন ধরনের হয়েছে

১. **অতি স্বল্পকালীন বাজার :** যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। কারণ ঐ অতি অল্পসময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ফলে চাহিদার বৃদ্ধি হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সকালের কাঁচা বাজার। এ ধরনের বাজারে সকালে স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি হলেও এই অল্প সময়ে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না।

২. **স্বল্পকালীন বাজার :** চাহিদার পরিবর্তন হলে যোগান খানিকটা সাড়া দিতে সক্ষম। এই বাজারে ফার্ম নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থেকে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগানে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে ফার্ম উৎপাদন কমাতেও পারে বা বাজারের অবস্থা খুব খারাপ হলে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনে যোগান কিছুটা সাড়া দিতে সক্ষম হয়।

৩. **দীর্ঘকালীন বাজার :** চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনের সাথে জোগানের যেকোনো পরিবর্তন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কোনো উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের আয়তন এবং উপকরণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি বহুদিন ধরে চলতে থাকলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তন করে উৎপাদন এবং জোগানের সাথে সমন্বয় করে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে।

অঞ্চলভেদে বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়

- **স্থানীয় বাজার :** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে সে দ্রব্যের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। যেমন: মাংসের বাজার।
- **জাতীয় বাজার :** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সেই দ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন, মোটা চালের বাজার।
- **আন্তর্জাতিক বাজার :** যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা দেশের ভূখণ্ডের বাইরেও বিস্তৃত থাকে, সেই দ্রব্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন- তৈরি পোশাক।

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণিবিভাগ

আগের অনুচ্ছেদে সময় অনুসারে বাজারের ধরন এবং স্থান বা আয়তন অনুসারে বাজারের ধরন সম্পর্কে আমরা পরিচিত হয়েছি। এখন সমগ্র বাজার কাঠামোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আলোচনা করব। সত্যিকার অর্থে এ ধরনের বিশ্লেষণই অর্থনীতির জন্য বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরনসমূহ হচ্ছে : ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রধানত তিন প্রকার। ক. একচেটিয়া বাজার খ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার গ. অলিগোপলি বাজার বাজার।

নিচে অতি সংক্ষেপে এ ধরনের কয়েকটি বাজারের ধারণা দেওয়া হলো।

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করেন। বাজারে চাহিদা ও জোগান দ্বারা পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হলে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এককভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান বাজারের একটা নগণ্য অংশ মাত্র। সুতরাং একজন বা অল্প কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্যের বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একবার দাম নির্ধারিত হলে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে ব্যক্তিগতভাবে তা মেনে নিতে হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১. **অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো দ্রব্যের অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে।

২. **দ্রব্যের একক সমজাতীয় :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিবেচিত পণ্য সমজাতীয় বা একই গুণসম্পন্ন হয়। পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে পণ্যের একটি একক অন্য একক থেকে পৃথক করা যায় না। যেসব দ্রব্যের এককগুলো গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকীকরণ করা যায়, তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে। যেমন- মোটা চাল, মসুরের ডাল।

৩. **ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত :** বাজারব্যবস্থা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হলে পণ্যের এককের গুণাগুণ এবং দাম সম্পর্কে সকল ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি অবহিত থাকে।

৪. **শিল্পে ফার্মসমূহের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান :** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের অধীনে শিল্পে ফার্ম দীর্ঘকালীন সময়ে অবাধে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে শিল্প ত্যাগ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ থাকে না।

৫. **বাহ্যিক প্রভাব নেই :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন, দাম নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইরের বা সরকারি প্রভাব থাকে না। মোট কথা হচ্ছে, কর আরোপ, ভর্তুকি প্রদান, রেশনিং ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার প্রভাব সৃষ্টি করে না।

৬. **উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উপকরণের অবাধ বিচরণ থাকে। শ্রম উপকরণসহ অন্যান্য উপকরণ বিচরণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ থাকে না। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উপকরণের গতিশীলতা থাকায় উপকরণ দাম সর্বত্র সমান থাকে।

৭. **নির্দিষ্ট দামে উৎপাদনকারী মুনাফা সর্বোচ্চকরণের প্রচেষ্টা নেয় :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের মূল লক্ষ্য থাকে সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। প্রদত্ত দামে ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘমেয়াদে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। মনে রাখা দরকার যে, মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হলে তাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে। এখানে ব্যয়ের মধ্যে উদ্যোক্তার পরিশ্রম এবং আয়ের মধ্যে উদ্যোক্তার পারিশ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করে হিসাব করা হয়েছে।

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রকারভেদ

ক) একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)

মনো (Mono) অর্থ এক, পলি (Poly) অর্থ বিক্রেতা। ফলে মনোপলি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একজন মাত্র বিক্রেতা। মনোপলি কথাটির অভিধানগত অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি, সরকার অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক

কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার। অতএব, যখন কোনো একটিমাত্র ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয়, তখন সেই ফার্মকে একচেটিয়া কারবারি এবং যে বাজারে ঐ দ্রব্যটি কেনা-বেচা হয়, সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। যে দ্রব্য বিক্রয়ে যে ফার্ম একচেটিয়া অধিকার লাভ করে, সেই ফার্ম বাজারে সেই দ্রব্যের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে। এই ফার্মটি ছাড়া আর অন্য কোনো ফার্ম একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন করতে পারে না বলে একচেটিয়া বাজারে ফার্ম শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। পুরোপুরি একচেটিয়া বাজার বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে প্রায় একচেটিয়া বাজারের বেশ কয়টি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, বাংলাদেশ অক্সিজেন, জয়দেবপুরে অবস্থিত সমরাস্ত্র কারখানা ইত্যাদি।

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopoly Market)

একচেটিয়া বাজার বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়।

১. **বিক্রেতা উৎপাদন বা জোগান নিয়ন্ত্রণ করে :** একচেটিয়া বাজারে একজনমাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা থাকে। তাই বিক্রেতা বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন ও জোগান সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

২. **নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই :** একচেটিয়া ফার্ম যে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রি করে, সে দ্রব্যের তেমন কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই। অর্থাৎ দ্রব্যটির সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় না।

৩. **সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা :** একচেটিয়া কারবারি যদি ব্যক্তি বা বেসরকারি খাত দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তার লক্ষ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

৪. **একচেটিয়া কারবারির ফার্ম ও শিল্প একই :** একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্ম থাকে। ফলে সে ফার্মটিই শিল্প হিসেবে পরিচিত।

৫. **এককভাবে দাম অথবা জোগান নিয়ন্ত্রক :** একচেটিয়া ফার্ম এককভাবে উৎপাদন জোগান দিয়ে থাকে। একমাত্র উৎপাদক হওয়ায় খুব সহজেই দ্রব্যের দাম অথবা জোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে ফার্মটি ইচ্ছামতো হয় দাম অথবা জোগান নিয়ন্ত্রণ করে; একসঙ্গে দুটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৬. **নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ :** একচেটিয়া শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশের সুযোগ নেই। নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে গেলে একচেটিয়া ফার্ম পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে নতুন ফার্ম সম্ভাব্য লোকসানের ভয়ে প্রবেশ করে না। সে জন্যই একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না।

কাজ : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা করো।

খ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য একযোগে দেখা যায়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ হলেও অভিন্ন নয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা বিদ্যমান। আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে উঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমনঃ গায়ে মাখার সাবান। বিভিন্ন কোম্পানির গায়ে মাখার সাবান ব্যবহার একই ধরনের হলেও এই সাবানগুলো পৃথক করা সম্ভব। যেমনঃ মোড়ক ভিন্ন বা গন্ধ ভিন্ন ইত্যাদি। এই সব সাবানের যেকোনো একটির দাম বাড়লে সাবানটির চাহিদা সামান্য কমতে পারে, তবে শূন্য হয় না। এই সাবানের ভক্ত ক্রেতা সব সময় এই সাবানটিই কেনে। এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও ক্রেতা দ্রব্য ভোগ ও ব্যবহার ত্যাগ করে না।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **ফার্ম/বিক্রেতার সংখ্যা :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা অসংখ্য। এক একটি ফার্ম বাজারে মোট উৎপাদনের একটি সামান্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে কোনো ফার্মের পক্ষেই পণ্যের মূল্য বা মোট উৎপাদনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এ জন্য অনেক সময় জোট বা দলভুক্ত ফার্ম থাকে।

২. **উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার অধীনে বিভিন্ন ফার্ম যেসব পণ্য উৎপাদন করে, সেগুলো অনেকটা সদৃশ হলেও একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব। দ্রব্যগুলো গুণগত ও বাহ্যিক দিক থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে। অর্থাৎ দ্রব্য পৃথকীকরণের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য সমজাতীয় নয়। এ জন্যই একচেটিয়া প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়।

৩. **শিল্পে ফার্মের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিল্পে ফার্মের প্রবেশ এবং প্রস্থানে ফার্মের কোনো বাধানিষেধ নেই। সাধারণত স্বল্পমেয়াদে কোনো ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা করলে দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে। আবার কোনো ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে দীর্ঘমেয়াদে শিল্প পরিত্যাগ করতে পারে। এ ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো বাধা নেই।

৪. **বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ :** প্রত্যেকটি ফার্ম তার পণ্যের বিক্রি বাড়াতে বেশি প্রচার করে। বেশি প্রচারের ফলে এই ফার্মগুলোর বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক বিক্রয়জনিত ব্যয় বেড়ে যায়। প্রচার ও দ্রব্যের গুণগতমানের মাধ্যমে এই ফার্মগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

৫. **চাহিদার প্রকৃতি :** কোনো ফার্ম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে অনেক ভোক্তা অপর ফার্মের পরিবর্তক দ্রব্য ক্রয় করলেও এমন কিছু ভোক্তা থাকে, যারা প্রথম ফার্মের পণ্যই কম পরিমাণে হলেও ক্রয় করে। অর্থাৎ কোনো ফার্ম পণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি করলেও সেই পণ্যের চাহিদা শূন্য হয় না। প্রতিটি ফার্মের জন্য কিছু কিছু ক্রেতার বিশেষ পছন্দনীয়তা থাকে বলে প্রতিটি ফার্মের চাহিদা রেখার আকৃতি সাধারণত এক রকম হয় না। চাহিদা রেখার আকৃতি মূলত নির্ভর করে বিবেচনাধীন ফার্মের দ্রব্য অপরাপর ফার্মের দ্রব্যের সাথে কতটুকু পৃথক তার উপর।

৬. **মুনাফা সর্বোচ্চকরণ :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার লক্ষ্য থাকে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা।

৭. **দ্রব্যের অনুকরণ :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একজন বিক্রেতা অপর একজন বিক্রেতার উৎপাদিত দ্রব্য পূর্ণ অনুকরণ করতে পারে না। ফলে প্রত্যেক বিক্রেতা বা ফার্ম একচেটিয়া ফার্মের মতো নিজ নিজ দ্রব্যের জোগান বা জোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৮. **দীর্ঘকালীন পরিস্থিতি :** দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ফার্মের মতো স্বাভাবিক মুনাফা হয়ে থাকে।

কাজ : একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ৫টি বৈশিষ্ট্য লেখো।

গ) অলিগোপলি বাজার

অলিগোপলি এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে কতিপয় বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করেন, এ ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যেমন, 'টেলিযোগাযোগ খাতের' ফার্ম তার পণ্যের বিজ্ঞাপনে একজন চলচ্চিত্রের নায়ককে ব্যবহার করলেন। সেটা পর্যবেক্ষণ করে আরেকটি ফার্ম তার বিজ্ঞাপনে একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়কে ব্যবহার করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।

অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Oligopoly Market)

১. **বিক্রেতার সংখ্যা :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে কতিপয় বিক্রেতা থাকে।

২. **দ্রব্যের প্রকৃতি :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজার সমজাতীয় অর্থাৎ দ্রব্যটি একই ধরনের বা প্রায় সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকরণ করা যায়।

৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারের একটি ফার্ম তার দ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৪. **বিজ্ঞাপনের প্রভাব :** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে ফার্মসমূহ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

কাজ : অলিগোপলি বাজারের ৩টি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫.২ বাংলাদেশের বাজারব্যবস্থা (Market System of Bangladesh)

এ অধ্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাজার এবং বেচা-কেনার ধরন লক্ষ করা যায়। বাস্তব উদাহরণ দ্বারা এই তিন ধরনের বাজার নিয়ে আলোচনা করা যায়।

১. **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার :** বাংলাদেশে কোনো পণ্যের বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নেই, তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কাছাকাছি বাজার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার এ বাজারের ভালো উদাহরণ। যেমন, ধানের প্রাথমিক বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং কোনো একজন উৎপাদক ধানের বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে না। এভাবে অন্যান্য খাদ্যশস্য, মাছ, মুরগি, ডিম, দুধ প্রভৃতির বাজারও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা তার কাছাকাছি। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে এ বাজার দেখা যায়। যেমন- রিকশা পরিবহণ।

২. **একচেটিয়া বাজার :** বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দেখা যায় না। তবে আমদানিকৃত পণ্য কিংবা সেবার ক্ষেত্রে এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন- জ্বালানি তেলের একমাত্র আমদানিকারক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন। ঢাকা শহরে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার বিদ্যমান। রেলপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে একক প্রতিষ্ঠান।

৩. **একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার :** বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্যের বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক। যেমন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী দ্রব্য। কোনো কোনো সেবার ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন- বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

কাজ: নিম্নলিখিত পণ্যগুলো স্থানভেদে কোন ধরনের বাজার তা উল্লেখ করে যুক্তি দাও।

পণ্যের নাম	বাজারের নাম ও যুক্তি
ক. আম	....
খ. কাঁঠাল	....
গ. তরিতরকারি	....
ঘ. মাছ	....
ঙ. তাঁত কাপড়	....
চ. চা	....
ছ. পেয়ারা, কলা, বরই	....
জ. নারিকেল	....
ঝ. গো-দুধ	....
ঞ. মাংস	....

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাজার বলতে কী বোঝায়?

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩. বাজারব্যবস্থায় তিনটি মৌলিক বিষয় কী কী?

৪. সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজার কত ধরনের হয় এবং কী কী?

৫. স্থানভেদে বাজার কয় ধরনের হয় এবং কী কী?

৬. একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের প্রকৃতি কী?

৭. ফার্ম ও শিল্পের ধারণা দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সময় মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করো।

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৩. একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।

৪. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।

৫. তোমার বইয়ে উল্লিখিত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কাঠামোর একটি ছক তৈরি করো।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের বাজারব্যবস্থার পরিচিতি দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পণ্যের গুণাগুণ এবং দাম সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি জানে' বৈশিষ্ট্যটি কোন বাজারের?

ক. একচেটিয়া

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক

গ. অলিগোপলি

ঘ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক

২. দামের নিয়মে বেচাকেনা হলো-

i. ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

ii. চাহিদা ও জোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

iii. নির্দিষ্ট মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

৯-১০

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সিদ্দিক সাহেব রাস্তার পাশের বাজার থেকে ছোট মাছ, মুরগি নিয়ে ৮টার সময় বাসায় আসেন, মিসেস সিদ্দিক সবজি আনতে বললে তিনি বলেন, এখন তো আর পাওয়া যাবে না।

৩. জনাব সিদ্দিক কোন ধরনের বাজার থেকে মাছ, মুরগি ক্রয় করেন?

ক. অতি স্বল্পকালীন　　খ. দীর্ঘকালীন

গ. অতি দীর্ঘকালীন　　ঘ. স্বল্পকালীন

৪. উক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো–

i. দ্রব্যের কেনা বেচার জন্য অনেক লোকের আগমন।

ii. বিক্রিত দ্রব্যগুলোর গুণাগুণ ও গঠন প্রকৃতি একই ধরনের।

iii. একই ব্যক্তি বাজারের দ্রব্যের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কামাল : আমাকে একটি ম্যাটাডর কলম দিন।

দোকানদার : ভাইয়া, এ সপ্তাহে ইকোনো কলমের দাম কমেছে, নেবেন কি?

কামাল : ম্যাটাডর থেকে ইকোনো কলম কি মানে-গুণে আলাদা?

দোকানদার : না, তেমন নয়। বাজারে অনেক কোম্পানি আছে, তাদের সবার কলম প্রায় একই মানের। কেবল দেখতে সামান্য ভিন্ন।

কামাল : তাহলে আমাকে ম্যাটাডরই দিন। এটিই আমার ভালো লাগে।

ক. ফার্ম কাকে বলে?

খ. স্বল্পকালীন বাজারের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

গ. কামালের ক্রয়কৃত দ্রব্যটি কোন বাজারের পণ্য? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে কামালের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

২. রিমি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের ব্যাগ ব্যবহার করে। সে নতুন একটি ব্যাগ বাজারে কিনতে গেলে দাম আগের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায়। এর কারণ জানতে চাইলে দোকানি জানায় যে, উক্ত ব্যাগ একটিমাত্র কোম্পানি আমদানি করে। কোম্পানি দাম বাড়ালে তাদের কিছু করার থাকে না। অনুরূপ কোনো ব্যাগ বাজারে না থাকায় রিমিকে উচ্চ দরে ব্যাগটি ক্রয় করতে হয়।

ক. উপকরণ কাকে বলে?

খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ বলতে কী বোঝায়?

গ. রিমির ক্রয়কৃত পণ্যটি কোন বাজারের? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলাদেশে রিমির ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের পরিধি কতটুকু? বিশ্লেষণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ

National Income and Its Measurements

একটি দেশের জাতীয় আয়ের ধারণা থেকে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায়। অর্থাৎ দেশটি কী উন্নত, উন্নয়নশীল, না অনুন্নত এ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কোনো দেশের জাতীয় আয় কত, তা জানার জন্য জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

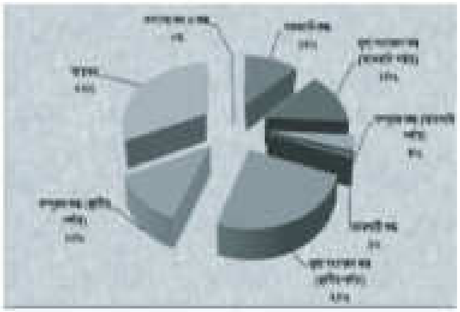

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মোট জাতীয় আয়ের (GNI) সাথে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) পার্থক্য দেখাতে পারব;
- মোট জাতীয় আয়ের (GNI) সাথে নিট জাতীয় আয়ের (NNI) তুলনা করতে পারব;
- জিডিপি (GDP) পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জিডিপির (GDP) নির্ধারকসমূহকে উপকরণ এবং প্রযুক্তি এই দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারব;
- জিডিপির (GDP) হিসাববহির্ভূত বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করতে পারব এবং
- বাংলাদেশের জিডিপি (GDP) পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

৬.১ জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ (Concepts of National Income)

মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

মনে করি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বছরে তিনটি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। যেমন- ১০০ কুইন্টাল ধান, ১০০০ জামা এবং ১০০০ কলম উৎপাদিত হয়। জিডিপি = ১০০ কুইন্টাল ধান × প্রতি কুইন্টাল ধানের বাজার দাম + ১০০০ জামা × প্রতিটি জামার বাজার দাম + ১০০০ কলম × প্রতিটি কলমের বাজার দাম। এভাবে কোনো দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্যের পরিমাণকে নিজ নিজ দাম প্রতি এককের দ্বারা গুণ করে তার সমষ্টি বের করে জিডিপি নির্ণয় করা হয়। তবে ধান থেকে যদি চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবে চাল তৈরি হয়, তাহলে আমাদেরকে হিসাবের সময় ধানের বদলে চাল উৎপাদন এবং চালের দামকে হিসাবে নিতে হবে।

মোট জাতীয় আয় (Gross National Income বা GNI)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে। একে মোট জাতীয় উৎপাদনও (GNP) বলে।

মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগ ফলকে বোঝায়। এই পরিমাণটি ঋণাত্মক হলে মোট জাতীয় আয় মোট দেশজ আয়ের চেয়ে কম হবে। আর এটি যদি ধনাত্মক হয়, তাহলে মোট জাতীয় আয় মোট দেশজ আয়ের চেয়ে বেশি হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে দ্বিতীয়টিই সত্য।

নিট জাতীয় আয় (Net National Income বা NNI)/ নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP)

কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পূরণের ব্যয় (Capital Consumption Allowance বা Depreciation) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে। মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে বোঝায়।

মোট দেশজ উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের সম্পর্ক

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)
+ বিদেশ থেকে প্রাপ্ত দেশীয় উপকরণের আয়
- দেশে কর্মরত বিদেশি উপকরণের আয়
মোট জাতীয় আয় (GNI)/মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)
- অবচয়জনিত ব্যয় (CCA)
নীট জাতীয় আয় (NNI)/নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP)
- পরোক্ষ কর (Indirect Tax)
জাতীয় আয় (National Income)

কাজ : (১) **GNI, GDP, CCA** -এদের পূর্ণ রূপ দাও।

কাজ : (২) **CCA (Capital Consumption Allowance)** আসলে কী?

৬.২ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ-উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি (Measurments of Gross Domestic Product- Production, Income and Expenditure Approach)

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) মূলত তিনভাবে পরিমাপ করা যায়। যথা: উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach), আয় পদ্ধতি (Income Approach) ও ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach)।

১. **উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach) :** একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়।

২. **আয় পদ্ধতি (Income Approach) :** এ পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হলো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। অতএব, মোট দেশজ উৎপাদন $= \sum$খাজনা$+\sum$মজুরি$+\sum$সুদ$+\sum$মুনাফা। এখানে, $\sum =$ সমষ্টি।

৩. **ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach):** এ পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হলো কোন নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি (= রপ্তানি − আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদন। মোট দেশজ উৎপাদন বা $Y= C+ I+ G+ (X-M)$ এখানে $C =$ ভোগ, $I =$ বিনিয়োগ, $G =$ সরকারি ব্যয়, $(X-M)$ (রপ্তানি - আমদানি) = নিট রপ্তানি।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত মোট দেশজ উৎপাদন মোটামুটি কাছাকাছি হলে পরিমাপ সঠিক হয়েছে বলে ধরা হয়। গণনা বা হিসাবের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে খানিকটা পার্থক্য হতে পারে, তবে প্রকৃত অর্থে তা একই ফলাফল বহন করে।

৬.৩ মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (Per Capita Gross Domestic Product)

মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনকে উক্ত বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

সূত্রাকারে, $\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \dfrac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের অন্যতম সূচক। বিশ্বব্যাংকের ধ্যানধারণা অনুসারে এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল। তবে বর্তমানে এ ভাবে না দেখে উচ্চ আয়ের দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ এবং নিম্ন আয়ের দেশ হিসাবে দেখার রীতি চালু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ২০৬৪ মার্কিন ডলার।

৬.৪ জিডিপির নির্ধারকসমূহ (Determinants of Gross Domestic Product-GDP)

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কত হবে তা নির্ভর করে দেশের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি, এসব সম্পদের পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতার উপর। এ জন্য এদেরকে মোট দেশজ উৎপাদনের নির্ধারক বলা হয়।

১. **ভূমি (Land) :** মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. **শ্রম (Labour) :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। শ্রমিকের সংখ্যা যদি বাড়ে এবং সে যদি প্রযুক্তির ব্যবহার জানে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, তবে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

৩. **মূলধন (Capital) :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলধনের অভাবের কারণে মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতরাং মূলধন মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

৪. **প্রযুক্তি (Technology)** : প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

৫. **সচলতা (Mobility)** : একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমাণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে পাট চাষ কমিয়ে ধান, গম বা ভুট্টা চাষে ভূমি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়।

৬.৫ জিডিপির হিসাববহির্ভূত বিষয়াদি (Factors not Included in GDP Calculation)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বলে। জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ কখনোও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

১. **মূলধনি লাভ-ক্ষতি (Capital Gains & Losses)** : সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না। তাছাড়া এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের লাভ যতটুকু হয়, অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। ফলে জিডিপি গণনায় লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য।

২. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা (Intermediary Goods and Services)** : জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকে জিডিপি গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

৩. **বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা (Goods and Services Free of Charge)** : অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন– মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্নাবান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি কোনো পণ্য নয়। এ জন্য জিডিপি গণনায় এসব অপণ্যায়িত সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

৪. অতীতে উৎপাদিত পণ্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় **(No Consideration of Previous Production and Transaction)** : যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন– পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপির মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে এক বছরের আয় আরেক বছরের আয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বন্ড, কাগজি লেনদেন জিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৫. সরকারি ঋণের সুদ **(Interest on Public Debt)** : সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেওয়া হয় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন– যুদ্ধকালীন সরকার যে ঋণ করে তা জাতীয় উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এ ঋণের বিপরীতে সুদ হস্তান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ জন্য জিডিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

৬. বেআইনি কাজ **(Illegal activities)** : বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। বেআইনি কার্যকলাপ বলতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজকে বোঝায়। যেমন– চুরি বা ঘুষের টাকা।

কাজ : মোট দেশজ উৎপাদনে গণনা করা হয় না, এমন সব দ্রব্য ও সেবার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

৬.৬ বাংলাদেশে মোট দেশজ আয় পরিমাপ পদ্ধতি (Method of Estimation of GDP in Bangladesh)

বাংলাদেশে জিডিপি গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি বছর চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি গণনা করে থাকে। এসব হিসাব করতে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি গণনা করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। খাতসমূহের অবদান চলতি বাজারমূল্যে প্রায় ৪৬০ বিলিয়ন ডলার (২০২২)।

১. কৃষি ও বনজ সম্পদ : কৃষি দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত ধরাবাঁধাভাবে হিসাব করা কঠিন। বাংলাদেশে GDP গণনা করতে এ খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়।

(ক) **শস্য ও শাকসবজি :** এ খাতে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ চলতি পাইকারি বাজারমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করা হয়। যেমন- ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,৯৯,৬৩১ কোটি টাকা।

(খ) **প্রাণিসম্পদ :** এ খাতের হিসাবও চলতি বাজার মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয়। প্রাণি সম্পদ উপখাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৩,২৯৩ কোটি টাকা।

(গ) **বনজ সম্পদ :** বন খাতের উপকরণের তথ্যের অভাবে মোট উৎপাদন হতে ৩% মূল্য বাদ দিয়ে যা থাকে, তাকে মূল্য সংযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে GDP বের করা হয়। এ উপখাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৫,৯১৬ কোটি টাকা।

২. **মৎস্য সম্পদ :** অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট মৎস্য আহরণের পরিপ্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাব করা হয়। এখাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯১,৮২২ কোটি টাকা।

৩. **খনিজ ও খনন :** শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খননকে আলাদা খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ খাতে (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল এবং (খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন বিষয়ের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্যের হিসাব করা হয়। এসব খাতের হিসাব দেশজ উৎপাদনের দিক থেকে গণনা করা হয়। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৯,১০২ কোটি টাকা।

৪. **শিল্প (ম্যানুফেকচারিং):** বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদন গণনার ক্ষেত্রে সকল শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে মোট দেশজ উৎপাদন বের করা হয়। এ খাতে ২০২০-২১ সালে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭,৪৯,৬৫৮ কোটি টাকা।

৫. **বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ :** এ খাতে সেবা সরবরাহ মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদন মূল্য হিসাব করা হয়। বাংলাদেশের জন্য এই খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পাশাপাশি এ খাতসমূহ বেসরকারিভাবেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৭,৮৭০ কোটি টাকা।

৬. **নির্মাণ :** নির্মাণ খাত থেকে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয় ব্যক্তি, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ভোক্তা এবং সরকারের প্রাপ্ত তথ্য থেকে। বাস্তবে এ খাত থেকে যে পরিমাণ আয় হিসাব হওয়ার কথা তার তুলনায় কম হয়। কারণ চলতি বাজারমূল্য সরকার প্রদত্ত বেঁধে দেওয়া মূল্য থেকে বেশি। অথচ সরকারি বেঁধে দেওয়া মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয়। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,১৯,৪৯০ কোটি টাকা।

৭. **পাইকারি ও খুচরা বিপণন :** এ হিসাবে পণ্যের পাইকারি মূল্য হিসাবের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ গণনা করা হয়। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৯৭,৬৫২ কোটি টাকা।

৮. **হোটেল ও রেস্তোরাঁ :** এই খাতের মোট দেশজ উৎপাদনের বিষয়টি উৎপন্ন দ্রব্যের ও সেবার বিক্রয় মূল্যের প্রেক্ষিতে হিসাব করা হয়। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯,৮৫৭ কোটি টাকা।

৯. **পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ :** এ খাত দেশজ আয় গণনার একটি বড় খাত। এ খাতটির বড় অংশ বেসরকারি হাতে ন্যস্ত আছে। ২০২০-২১ সালে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে মোট আয় হয় ২,৯৪,৬৬৩ কোটি টাকা।

১০. **আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা :** এ খাতের হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত মূল্যের ভিত্তিতে। এ খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,১৫,২৭১ কোটি টাকা আয় হয়।

১১. **রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা :** এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাপের ভিত্তিতে। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,১৩,০২৯ কোটি টাকা।

১২. **লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা :** এ খাত থেকে প্রাপ্ত দেশজ আয়ের হিসাব করা হয় মূলত ব্যয়ের দিক থেকে। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,১৬,৯৯৬ কোটি টাকা।

১৩. **শিক্ষা :** বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে মোট দেশজ উৎপাদন হিসাব করা হয় ব্যয়ের দিক থেকে। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৫,৬৪২ কোটি টাকা।

১৪. **স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা :** স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের বিষয়টি হিসাব করা হয় ব্যয় পদ্ধতিতে। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১,৮৫০০ কোটি টাকা।

১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা : এ খাতে ব্যয়ের দিক থেকে মোট দেশজ উৎপাদন গণনা করা হয়। এ খাতে ২০২০-২১ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,৮০,৬৭৭ কোটি টাকা।

[এই অধ্যায়ের প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মোট দেশজ উৎপাদনের ধারণা দাও।

২. মোট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়?

৩. নিট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়?

৪. GNI, GDP, NNI, GNP এদের পূর্ণরূপ দাও।

৫. CCA বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করো।

২. মোট দেশজ উৎপাদনের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করো।

৩. মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাববহির্ভূত বিষয়সমূহের বর্ণনা দাও।

৪. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির উপখাতগুলোর অবদান বর্ণনা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে কী বলে?

ক. জাতীয় আয় খ. নিট আয়

গ. জিডিপি ঘ. মাথাপিছু আয়

২. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) গণনায় নিচের কোনটি ধরা হয়?

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য খ. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবার মূল্য

গ. সরকারি ঋণের সুদ ঘ. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রুমানা তাঁর বাড়ির আঙিনায় সাধারণ বীজ বপন করে প্রথম বছর যে পরিমাণ সবজি পান পরের বছর উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে তার চেয়ে বেশি সবজি পান।

৩. রুমানা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন?

ক. ভূমি   খ. শ্রম

গ. প্রযুক্তি   ঘ. মূলধন

৪. উৎপাদন ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তন–

i. GDP বৃদ্ধি করে

ii. GNI বৃদ্ধি করে

iii. NNI হ্রাস করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা : ১

শিহাব ১০ বছর যাবৎ বাহরাইনে কর্মরত। তিনি প্রতি মাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে প্রেরণ করেন।

ঘটনা : ২

মিসেস ব্রাউনি ব্রিটেনের নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতি মাসে তিনিও তাঁর দেশে টাকা পাঠান।

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে?

খ. আয় পদ্ধতিতে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়? বুঝিয়ে লেখো।

গ. শিহাবের অর্থ প্রেরণ আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়, ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মিসেস ব্রাউনির আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? তোমার মতামত দাও।

২. জহির তার নানাবাড়ি মধুপুরে বেড়াতে যায়। তার নানা পুকুরে মাছ চাষ করেন। জহির তার নানাবাড়ির পাশে প্রচুর গাছপালা ও জীবজন্তু দেখতে পায়। সে জানতে পারে এটি একটি বিশেষ ধরনের অঞ্চল।

ক. CCA-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?

গ. জহির তার নানাবাড়ির পাশে যে অঞ্চলটি দেখতে পায়, সেটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জহিরের নানার চাষকৃত মাছের অবদান বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়
অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা
Money and Banking System

নাবিলের বাবা একজন চাকরিজীবী। মাসের শেষে বেতন পান ২০,০০০ টাকা। তিনি পারিবারিক ব্যয়ের জন্য কিছু টাকা নগদ রাখেন এবং কিছু টাকা ব্যাংকে আমানত রাখেন। কিছুদিন পর তিনি ঠিক করলেন মুরগির খামার দেবেন। এজন্য তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন। ব্যাংক তাকে ১০% সুদে ৩৬ মাসে পরিশোধ করার শর্তে এই ঋণ প্রদান করে। তাঁর আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও ঋণ সবই অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অর্থ ও ঋণের ব্যবসা ব্যাংকে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ব্যাংক জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন, আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- অর্থের ধারণা এবং অর্থের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা এবং এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা এবং এর প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করতে পারব;
- কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব এবং
- চার্ট অঙ্কন করে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা প্রদর্শন করতে পারব।

৭.১ অর্থ ও অর্থের প্রকারভেদ (Money and its Classification)

দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষক তার ধানের বিনিময়ে তাঁতির কাছ থেকে কাপড় এবং জেলে তার মাছের বিনিময়ে কুমারের কাছ থেকে হাঁড়ি-পাতিল সংগ্রহ করত। এভাবে মানুষ এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে সরাসরি পণ্য বিনিময় প্রথা (Barter System) বলে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো এ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। তবে এ প্রথায় লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা অসুবিধায় পড়তে হতো (যেমন- দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা ও পারস্পরিক অভাবের অমিল ইত্যাদি)। এসব অসুবিধা দূর করতে অর্থের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজনস্বীকৃত ও গৃহীত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে। বিভিন্ন দেশে অর্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রুপি, আমেরিকায় ডলার এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইউরো।

অর্থের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

তৈরির উপকরণের দিক থেকে অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) ধাতব মুদ্রা ও

২) কাগজি নোট

ধাতবমুদ্রা

ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে, তাকে ধাতবমুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি ধাতবমুদ্রা আছে।

বর্তমানে প্রচলিত ধাতবমুদ্রা

ধাতব মুদ্রাকে বস্তুগত মূল্যমানের দিক থেকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) প্রামাণিক মুদ্রা (খ) প্রতীক মুদ্রা। প্রামাণিক মুদ্রা বলতে বোঝায় যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়। আর প্রতীক মুদ্রা বলতে বোঝায়, যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে। সাধারণত ধাতব মুদ্রা সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয়।

কাগজি নোট

যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয়, তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে। নোটের উপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক, যা সাধারণত নোটের কাগজটির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। প্রায় সকল দেশেই কাগজি মুদ্রা বা নোট সরকারি নির্দেশে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের কাগজি মুদ্রা হলো ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

কাগজি মুদ্রাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা (খ) রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা।
রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে রূপান্তরযোগ্য নোট হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট। আর রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রুপা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে রূপান্তর অযোগ্য কাগজি নোট হলো ১ টাকা ও ২ টাকার নোট। গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্থকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১) বিহিত অর্থ, ২) ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ।

বিহিত অর্থ

যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত, তাকে বিহিত অর্থ বলে। আমাদের দেশের বিহিত অর্থ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট নিয়ে গঠিত। বিহিত অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়- ক) অসীম বিহিত অর্থ, খ) সসীম বিহিত অর্থ। অসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায়, যে বিহিত অর্থ দ্বারা আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। আমাদের দেশের অসীম বিহিত অর্থ হলো– ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট। সসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায়, যে বিহিত অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়, আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ইচ্ছা অনুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের সসীম বিহিত অর্থ হলো– ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা।

ব্যাংকসৃষ্ট অর্থ

বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংকে হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। তবে তা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা ঋণ প্রদান করে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে।

ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড

ব্যাংকসৃষ্ট আমানত বা ওভার ড্রাফটের বিপরীতে চেক কেটে লেনদেন করা যায়। ব্যাংকসৃষ্ট আমানত বা হিসাবকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা চলে। আমাদের দেশে ব্যাংকসৃষ্ট অর্থ হলো- চলতি হিসাবে আমানত এবং সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত, যা চেকের দ্বারা তোলা যায়। এ ছাড়া ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

কাজ : অর্থের প্রকারভেদের ছক তৈরি করো।

৭.২ অর্থের কার্যাবলি (Function of Money)

আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থায় এবং সমাজজীবনে অর্থ নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে।

কবি অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

যাহা করে বিনিময় ও মূল্য পরিমাপ
ঋণ পরিশোধ আর সঞ্চয় সাধন
অর্থ বলি গণ্য তারে করে সর্বজন।

ইংরেজি কবিতার দুটি চরণে অর্থের কার্যাবলি প্রকাশ পায়–

Money is a matter of functions four;
A medium, a measure, a standard, a store.

অর্থাৎ, অর্থের কাজ হলো চারটি। যথা : বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, লেনদেনের বাহন ও সঞ্চয়ের বাহন।

নিচে অর্থের প্রধান চারটি কাজের বিবরণ দেওয়া হলো :

বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। তাই বলা যায়, অর্থ বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম।

মূল্যের পরিমাপক

মিটার যেমন দৈর্ঘ্যের, কিলোগ্রাম যেমন ওজনের পরিমাপক, ঠিক তেমনি অর্থ পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমির একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক। অর্থের সাহায্যে আমরা সহজেই পণ্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে অতীত ও ভবিষ্যতের পণ্য ও সেবার মূল্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

সঞ্চয়ের বাহন

অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থ দ্বারা সবকিছু বিনিময় করা যায় বলে এরূপ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারে। কারণ অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় অনেক বেশি নিরাপদ ও তুলনামূলকভাবে স্থায়ী।

স্থগিত লেনদেনের বাহন

স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। এসব দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ অর্থের মাধ্যমেই করা হয়। অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ সহজ এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতে পারে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতিও ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে ঋণের স্থগিত লেনদেনের বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়।

উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও অর্থমূল্য স্থানান্তরের বাহন, তারল্যের মান ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। অর্থের এই কাজগুলো পৃথক নয়, এদের একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই বলা হয়, অর্থের সকল কাজের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে।

কাজ : অর্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করেছে- ব্যাখ্যা করো।

৭.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ ব্যাংকে আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের উপর কম হারে সুদ দেয়। অন্যদিকে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ আদায় করে। উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। এ ব্যাংক জমাদানকারীকে তার জমাকৃত অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে বলে ব্যাংক তার তহবিল থেকে স্বল্পকালের জন্য ঋণ প্রদান করে। তাই এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হলো : সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ইত্যাদি।

সোনালী ব্যাংক ভবন

জনতা ব্যাংক ভবন

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

আধুনিক কালে বাণিজ্যিক ব্যাংক বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. আমানত গ্রহণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে। যথা– (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত, (গ) স্থায়ী আমানত।

(ক) চলতি আমানত : চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যেকোনো সময় ওঠাতে পারেন। এজন্য এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।

(খ) **সঞ্চয়ী আমানত :** সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সাধারণত সপ্তাহে দুবার ওঠানো যায়। এই আমানতের উপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়।

(গ) **স্থায়ী আমানত :** এ আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন– ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের উপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। এক্ষেত্রে কিছু বিধিবিধান অনুসরণ করতে হয়।

২. ঋণ দান করা

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারীর চাহিদা মেটানোর জন্য গচ্ছিত রেখে বাকি অর্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান করে। উপযুক্ত জামানত ও বন্ধকির যেমন- মূল্যবান ধাতু, ধাতব দ্রব্য, সরকারি ও দেশি-বিদেশি ঋণপত্র, স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদি এর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক গৃহনির্মাণ, মৎস্য চাষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দেয়।

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ই-পেমেন্ট, হুন্ডি ও ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি সৃষ্টি করে। বিনিময় মাধ্যমগুলোর মধ্যে ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক বহুল ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

৪. দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তায় ব্যবসায়ীদের অর্থ জোগান দেওয়ার পাশাপাশি পরামর্শও দিয়ে থাকে। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, বিল বাট্টাকরণ, আমদানি ও রপ্তানিকারককে ঋণ প্রদান, মেইল ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রব্য আদান-প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি হয়। এসব কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংকে কার্যক্রমে প্রযুক্তি

৫. অর্থ স্থানান্তর

গ্রাহকদের প্রয়োজনে ব্যাংক এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ প্রেরণ করে। অর্থ প্রেরণের মাধ্যম হলো চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, মেইল ট্রান্সফার ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি।

৬. রেমিট্যান্স

বিদেশে কর্মরত সকল জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে এবং দেশীয় সংশ্লিষ্ট মালিককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তান্তর করে বাণিজ্যিক ব্যাংক যথাযথ সেবা প্রদান করে।

৭. সঞ্চয় বৃদ্ধি

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। ব্যাংক সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

এ ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে–

(ক) জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, যেমন- দলিলপত্রাদি ও মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে।

(খ) বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, মেয়াদি ঋণপত্র (Debenture) ও সরকারি বণ্ড ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে।

(গ) সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক অছির দায়িত্ব পালন করে।

(ঘ) গ্রাহকদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে।

(ঙ) গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, বাড়িভাড়া, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে।

উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ : বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে? ব্যাখ্যা করো।

৭.৪ ব্যাংক হিসাব খোলার ও পরিচালনার নিয়ম

সুজন তার অর্জিত আয়ের একটি অংশ ব্যাংকে জমা রাখার জন্য তার উপজেলা সদরে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখা অফিসে যায়। সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা মাসুদ সাহেব তাকে হিসাব খোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মাসুদ সাহেব প্রথমে সুজনকে তিন ধরনের যেমন- (১) চলতি হিসাব,

(২) সঞ্চয়ী হিসাব ও (৩) স্থায়ী হিসাবের ধারণা দেন। তিনি বলেন সব ধরনের হিসাব খোলার নিয়ম মোটামুটিভাবে এক। আমাদের দেশের সব ব্যাংকে হিসাব খোলার নিয়মাবলি প্রায় একই ধরনের। সুজন সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে প্রথমে ব্যাংকের শাখা অফিস থেকে একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী তাকে (আবেদনকারীকে) শনাক্ত করার জন্য আবেদনপত্রে সায়েমের তথ্যসহ স্বাক্ষর নিতে হয়। কেননা সায়েমের উক্ত ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। সায়েমকে শনাক্ত প্রদানকারী বা পরিচয়দানকারী বলে। এছাড়া আবেদনপত্রে সুজন স্ত্রীকে নমিনি করে তার তথ্যও লিপিবদ্ধ করে (নমিনি বলতে বোঝায় ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ আমানতকারীর অবর্তমানে/মৃত্যুর পর তার মনোনীত যে বা যারা জমাকৃত অর্থের অধিকারী হবে)।

পূরণকৃত আবেদনপত্রের সাথে সুজন ও তার স্ত্রীর (আবেদনকারী ও নমিনির) পাসপোর্ট আকৃতির সত্যায়িত ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করে। পূরণকৃত আবেদনপত্রটি মাসুদ সাহেবের কাছে জমা দেয়। তখন মাসুদ সাহেব তাকে ন্যূনতম ৫০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে বলেন (বিভিন্ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জমার পরিমাণ কমবেশি হতে পারে)। কিছু সময়ের মধ্যে মাসুদ সাহেব ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে হিসাব খুলে একটি ব্যাংক হিসাব নম্বর সুজনকে প্রদান করেন এবং একটি চেকবই ও একটি জমাবই প্রদান করেন। সুজন পরবর্তীতে এ হিসাব নম্বরে জমাবই দ্বারা তার ইচ্ছামতো নগদ অর্থ, চেক, ব্যাংক ড্রাফট জমা দেয় (এ ছাড়া অনলাইনে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে হিসাব নম্বরে টাকা জমা দেওয়া যায়)। জমাকৃত টাকা থেকে চেকের মাধ্যমে ও এটিএম কার্ডের মাধ্যমে (যেখানে এটিএম বুথ আছে) ব্যাংকের নিয়মের ভিত্তিতে টাকা তোলা যায়।

বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। তাই আমানতকারী কোন কোন তারিখে কত টাকা তুলল এবং কত টাকা জমা দিলো তার বিবরণী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারে (এমনকি ইচ্ছা করলে তার হিসাব বন্ধ করে নিতে পারে)। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আমানতকারী বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে।

সুজনের মতো সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো ব্যাংকে যেকোনো ধরনের হিসাব খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ জমাদান করতে এবং ওঠাতে পারে।

কাজ : ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

"সোনালী ব্যাংকে হিসাব খোলার একটি নমুনা ফরম"

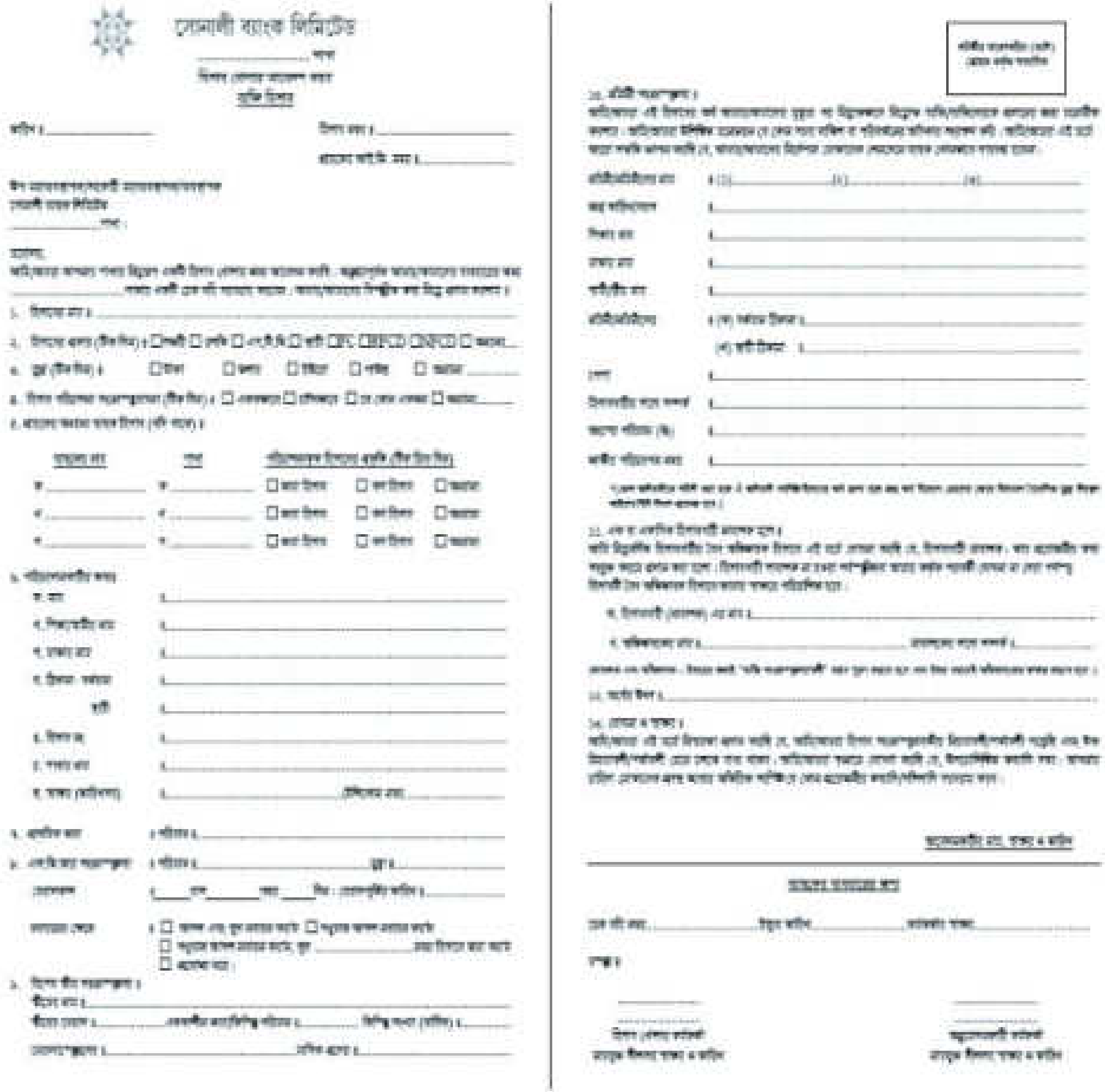

ব্যাংকে হিসাব খোলার আবেদনপত্রের অংশবিশেষ

৭.৫ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংক-ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তাই এর প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয়; বরং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি স্বাধীন দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। যেমন : বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম এবং ইংল্যান্ডের ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ইত্যাদি।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ভবন

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ভবন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

প্রত্যেক দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার ও মুদ্রাবাজারের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা হলো–

১ নোট ও মুদ্রা প্রচলন

কোনো দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে। এ ব্যাংক দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করে। অতীতে দেশে নোট প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আইন অনুযায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে হতো। বর্তমানে দেশে অর্থের যোগান ও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির উপর নির্ভরশীল।

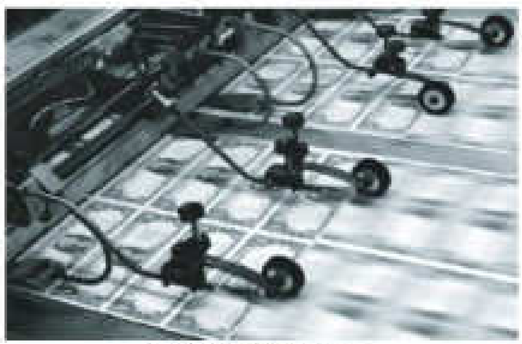

কাগজি নোট ছাপানো

২. সরকারের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব পাওনা সরকারের হিসাবে জমা করে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে। আর্থিক সংকটের সময় সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করে। তার অধীন তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে। আইন বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখতে হয়। এ গচ্ছিত তহবিল হতে প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কেননা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে ঋণ দেয় তা মোট অর্থের জোগানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা দামস্তর এবং অর্থের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঋণের আধিক্যের জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়। ঋণের স্বল্পতার জন্য দেশে মুদ্রা সংকোচন হয়। এসব অসুবিধা যেন দেখা না দেয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে।

৫. সর্বশেষ ঋণদাতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কখনও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটাপন্ন ব্যাংকসমূহের নির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে ও বিভিন্ন ঋণপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, টাকার বিপরীতে ডলার, ইউরো ইত্যাদির বিনিময় হার নির্ধারণ। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

৭. নিকাশ ঘর

দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পেঅর্ডার আদান-প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার বা দেনাদার হয়। কোনো ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কত পাওনা বা কত দেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংরক্ষণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে অর্থ বা তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে, তা থেকে এরকম দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে। এভাবে এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডারের নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে-

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

(খ) অধিভুক্ত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা সময়ান্তে যাচাই করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

(গ) জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন নিয়মকানুন তৈরি ও বাস্তবায়ন করে।

(ঘ) দেশে-বিদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখা স্থাপনে সহায়তা করে।

(ঙ) দেশবাসীর অবগতির জন্য এবং সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করে এবং গবেষণার কাজ পরিচালনা করে।

(চ) অর্থনীতির বিভিন্ন খাত, যেমন- কৃষি, শিল্প, সেবা (ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য) খাতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে।

উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

> কাজ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে- ব্যাখ্যা করো।

৭.৬ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

আমাদের দেশের মুদ্রাব্যবস্থার তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর জনসাধারণের আমানত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। অন্যদিকে বিশেষ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিশেষায়িত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার চার্ট অঙ্কন করা হলো :

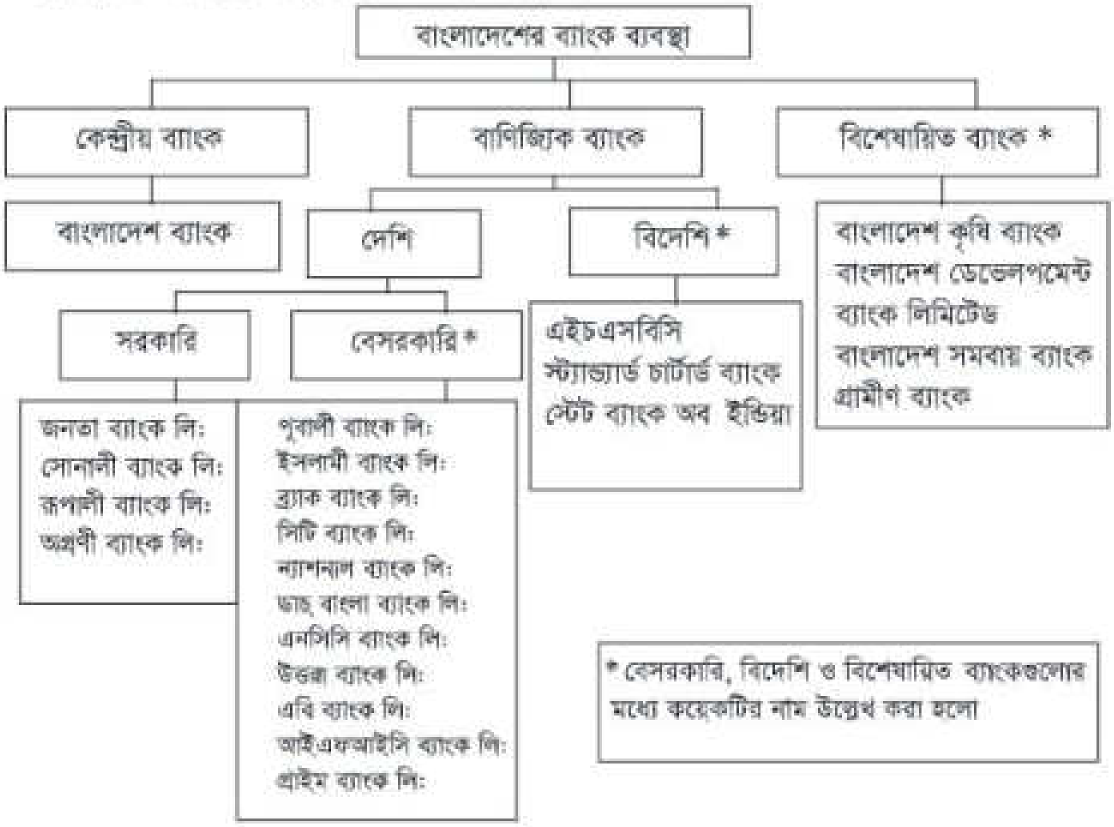

৭.৭ কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাংকের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

বাংলাদেশ ব্যাংক

মনোগ্রাম (বাংলাদেশ ব্যাংক)

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির "বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২"-এর বলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ ও ঋণব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে স্থিতিশীল মূল্যস্তর বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান তথা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে এ ব্যাংক নিম্নোক্তভাবে ভূমিকা পালন করে :

দেশের কৃষি খাতে প্রয়োজনমাফিক কৃষিঋণ সরবরাহে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদারভাবে ঋণ তহবিল প্রদান করে। এ ছাড়া কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা ও কৃষি পরিসংখ্যান তৈরি করে এ ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে।

দেশের দ্রুত শিল্পায়নের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প মূলধন সরবরাহকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ তহবিল সরবরাহ করে। শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণি-বিকাশে উদ্বুদ্ধকরণ ঋণ সহায়তা করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণপত্রের বিনিময়ে ঋণ প্রদান, নতুন ব্যাংক স্থাপন এবং অনুন্নত এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপন করে, ঋণের জোগান নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ব্যাংক নিজ উদ্যোগে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

কাজ : অর্থব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক- ব্যাখ্যা করো।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি ও বেসরকারি এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো–

কৃষি ও শিল্প খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ফলে কৃষি উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। এ দেশের অধিকাংশ কৃষক গরিব। তাই তাদের কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য দরকার পর্যাপ্ত কৃষিঋণের। বর্তমানে কৃষি উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে সরকার ঘোষিত কৃষি ঋণদান কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ক্রয়, পানি সেচের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন এবং কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের কৃষক মাত্র ১০ টাকা জমা রেখে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পাচ্ছে। এতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সকল কৃষকের ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। তা থেকে ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা দান করে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। এ ছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। বর্তমানে এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিকশা ও ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-গম ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। এর ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কাজ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক- ব্যাখ্যা করো।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। নিম্নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষির সাথে জড়িত খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

ক. আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। তাই কৃষকের ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য (যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি ক্রয় এবং জমি চাষ, ফসল নিড়ানো, ফসল কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য) এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

খ. জমি সমতল করা, অগভীর নলকূপ স্থাপন, চাষের জন্য গবাদি পশু এবং হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক কৃষককে মধ্যমমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

গ. জমি ও ভারী যন্ত্রপাতি (যেমন- ট্রাক্টর, হারভেস্টর ইত্যাদি) ক্রয়, গভীর নলকূপ স্থাপন, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, পানি সেচের উদ্দেশ্যে খাল খনন, চা বাগানের উন্নয়ন এসব কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ ৫ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

এ ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ, মৎস্য খামার তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে, যা নিয়ে আমাদের বেকার যুবকরা তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

কাজ : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষিঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব–ব্যাখ্যা করো।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে সরকার ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে Vendors Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠান দুটির দায়, সম্পদ ও জনবল নতুন প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পিত হয়েছে। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো–

এ ব্যাংক সাধারণত আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করে, যেমন- পাটশিল্প, চামড়াশিল্প, চিনিশিল্প ও সারশিল্প ইত্যাদি। পল্লি এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।

এই ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন শিল্প নির্মাণ, পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এই ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। শিল্প কারখানার প্রয়োজনে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণও প্রদান করে। উদ্যোক্তাকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদান এবং শিল্পায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার গবেষণা, পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

স্বনির্ভরতা অর্জন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মেয়াদি ঋণ প্রদান করছে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। বেসরকারিভাবে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দান ও শিল্প কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করে।

কাজ : উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের ভূমিকা লেখো।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। জনসাধারণকে এ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। এটি সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংক নয়। আইনত এর প্রধান মালিক হচ্ছেন এর দরিদ্র ত্রিশ লক্ষ গ্রাহকবৃন্দ। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো–

এ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করে। কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক শাকসবজি চাষ, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও জমি চাষাবাদ ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করায় কৃষককে গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে কঠিন শর্তে ও চড়া সুদে ঋণ নিতে হয় না।

গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে অকৃষি খাতে সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে (যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, বিড়ি তৈরি, সাবান তৈরি, কাপড় তৈরি ও মিষ্টি তৈরি) ঋণ প্রদানসহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। গ্রামীণ ফোনের কারিগরি সহায়তায় গ্রামের সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য পল্লিফোন চালু করে।

সুবিধাবঞ্চিত বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যাংক হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এ ব্যাংক ভিক্ষুককে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে। নারীকে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে এ ব্যাংক সহায়তা করে। দরিদ্র অসহায় নারীদের ঋণ হিসেবে পল্লিফোন প্রদান করা হয়। এর আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করে নারীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়। প্রতিবছর এর লভ্যাংশ থেকে দরিদ্র গ্রাহক মালিকদের ডিভিডেন্ডও (Dividend) প্রদান করা হয়।

কাজ : সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

সমবায় ব্যাংক

সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করাই সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। সরকার ও দেশের সমবায়ীর যৌথ মালিকানায় পরিচালিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির শেয়ারের ৮৬% মালিক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ১৪% সরকারের মালিকানায়। নিম্নে সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো–

এ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিঋণ প্রদান করে। ঋণ প্রদানের খাতগুলো হলো- কৃষি, ভূমি উন্নয়ন, আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষ, শীতকালীন ফসল ও শাকসবজি উৎপাদন, বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক, সেচযন্ত্র ও ট্রাক্টর ইত্যাদি। কৃষিঋণের মেয়াদ তিন ধরনের হয়, যেমন : স্বল্পকালীন- ৬ মাসের জন্য, মধ্যম মেয়াদি- ২ বছরের জন্য এবং দীর্ঘকালীন- ৫ বছরের জন্য প্রদান করে।

সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহে এবং নির্মাণশিল্পে এ ব্যাংক অর্থায়ন করে।

এ ব্যাংকে গ্রামীণ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের অংশীদার সমবায় ব্যাংক। এছাড়া দেশের আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়, যেমন- মাছ চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। যার ফলে দেশের বেকারত্ব লাঘবের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থ বলতে কী বোঝায়?

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?

৩. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি?

ক. ঋণদান খ. আমানত গ্রহণ

গ. অর্থ স্থানান্তর করা ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

২. নিচের কোন মুদ্রা যেকোনো পরিমাণে লেনদেন করা যায়?

ক. ২ টাকার কয়েন খ. ২ টাকার কাগজি মুদ্রা

গ. ৫ টাকার কয়েন ঘ. ৫ টাকার কাগজি মুদ্রা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আরিফ তার সঞ্চিত অর্থ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখে। বছর শেষে সে তার জমাকৃত অর্থ অতিরিক্ত অর্থসহ উত্তোলন করে।

৩. আরিফের লেনদেনকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক　　খ. সমবায় ব্যাংক

গ. সোনালী ব্যাংক　　ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৪. দেশের অর্থনীতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান হচ্ছে—

i. পুঁজি গঠন করা

ii. মুদ্রার মান সংরক্ষণ

iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রত্না একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার প্রতিষ্ঠান জনগণকে ঋণ দিতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে তার বান্ধবীও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এটি জনগণের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

ক. বিনিময় প্রথা কী?

খ. সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থের কাজ বর্ণনা করো।

গ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বান্ধবীর প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

২. হারুনের স্ত্রীর একটি শাড়ির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তার কাছে একটি ছাগল ছাড়া কিছুই নেই। হারুন তার ছাগল নিয়ে তাঁতির কাছে গেলে তাঁতি একটি শাড়ির বদলে ছাগল নিতে চায়। কিন্তু হারুন একটি শাড়ির বদলে ছাগলটি দিতে রাজি হয়নি। ফলে এই ব্যবস্থায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। পরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অসুবিধা দূর হয়।

ক. বিহিত অর্থ কাকে বলে?

খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?

গ. হারুন তাঁতির কাছে গিয়ে শাড়ি কিনতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সবার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্রব্যটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

The Economy of Bangladesh

জনাব রতন একজন ধনী কৃষক। গত কয়েক বছর ধরে তাঁর জমিতে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। পারিবারিক ব্যয় বহন করার পর উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত অর্থ জনাব রতন সঞ্চয় করেন। গত বছর তিনি একটি ছোট তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন, যা তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী পরিচালনা করেন। সেখানে তাঁর গ্রামের নারী শ্রমিকেরা কাজ করে। তাঁরা তাঁদের একমাত্র ছেলে রনীকে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করেন। রনী অসুস্থ হলে তাকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা দেওয়া হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, যেমন: কৃষি, শিল্প এবং সেবা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) বর্ণনা করতে পারব;
- দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতের (কৃষি, শিল্প ও সেবা) তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করতে পারব;
- খাতভিত্তিক অর্থনীতির তথ্য-উপাত্ত ব্যাখ্যা এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারব এবং
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান চিত্র অঙ্কন করে প্রদর্শন করতে পারব।

৮.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bangladesh Economy)

প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শোষণ ও ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। উপরন্তু ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতাযুদ্ধে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর চার দশক ধরে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন একটি নিম্নমধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ করা যায়:

১. কৃষি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিঋণের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। ক্রমান্বয়ে এ অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচসুবিধা বাড়ছে। একই সাথে উৎপাদনও বাড়ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (ফসল, প্রাণিসম্পদ, বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ) অবদান প্রায় ১৩.৩৫ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪০.৬২ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (২০১৬-১৭ সালের এল.এফ.এস অনুযায়ী)।

কৃষিকাজ

২. শিল্প

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। তাই এ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বাড়াতে আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ২০১৬ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো- কর্মসংস্থান বাড়ানো, শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কমানো। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচি হলো- বিনিয়োগে বাধা কমানো, কর মুক্ত করা, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং

কারখানায় কর্মরত শ্রমিক

শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন। এসব কর্মসূচির সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৩৫.১৪ শতাংশ। কিন্তু মোট শ্রমশক্তির ২০.৪০ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত। (এল. এফ. এস., ২০১৬, বি.বি.এস)

৩. মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি

এ দেশে কৃষি ও শিল্পের স্বল্প উৎপাদন, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকার মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। ২০১৯ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী মাথাপিছু আয় ১৭৫১ মার্কিন ডলার (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) এবং ২০২০ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী মাথাপিছু আয় ২০৬৪ মার্কিন ডলার। অতএব, আমাদের দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ধীরগতিতে বাড়ছে।

৪. জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি

২০২০ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের দেশে চরম দারিদ্র্যসীমা ১০.৫% (২০১৮-১৯ সালে পরিমাপকৃত), গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৬%, সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৯৮.১% (টিউবওয়েল) এবং সাক্ষরতার হার ৭৪.৪%।

৫. বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি

আমাদের মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় ক্ষমতা কম। তাই বিনিয়োগ বা পুঁজি গঠনের হারও কম। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক উদ্দীপনামূলক ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করেছে। এর ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৩১.৭৫ শতাংশে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যা আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

৬. খাদ্যঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা

বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সরকার সার্বিক কৃষি খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদন-ব্যবস্থায় উন্নত বীজ, সার এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী এ দেশে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ (২০১১ সালের আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী)। ২০১৯ সালের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%, যা ২০০১ সালে ছিল ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পেলেও আয়তনের দিক দিয়ে অনেক ছোট এই দেশটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে নবম বৃহত্তম দেশ। ২০২০ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১১২৫ জন (২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী)।

৮. বেকারত্ব

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। ফলে এ দেশে বেকারত্ব দেখা যায়।

ঢাকা ইপিজেড

তবে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (EPZ: Export Processing Zone) বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করায় বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু হচ্ছে। যার ফলে বেকার সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে আরও কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

৯. প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবকাঠামোগত উপাদান। বর্তমানে এসব সম্পদের আবিষ্কার ও ব্যবহার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ খাতের সমন্বিত অবদান স্থির মূল্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.৭২ শতাংশ হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পূরণ করে। আমাদের দেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মোট ৫টি কয়লাক্ষেত্রের (রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জ) মোট মজুদ প্রায় ৩৩০০ মিলিয়ন টন। উত্তোলিত কয়লার ৬৫ ভাগ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

কয়লা খনি

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

১০. বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বহুমুখী চাহিদা পূরণ এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের ভোগ্যপণ্য ও মূলধনি দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা আমাদের রপ্তানি আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এ জন্য বাণিজ্যের ভারসাম্যে অব্যাহত ঘাটতি দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের (রেমিটেন্স) কারণে আমাদের চলতি হিসাব খাতে ঘাটতি দূর হয়ে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে।

১১. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা যায় না। তাই বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে আশার কথা হলো বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার হার হ্রাস পাচ্ছে। কেননা এসব সাহায্যের অপর্যাপ্ততা, অনিশ্চয়তা, প্রতিকূল শর্তসমূহ ও সময়ক্ষেপণের দরুন আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়ছে, যা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামো যেমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকার শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন খাত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

পদ্মা ব্রিজ

১৩. বেসরকারিকরণ কর্মসূচি

আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আওতায় বেসরকারি খাতের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বেসরকারীকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৭৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর ফলাফল মিশ্র প্রকৃতির।

১৪. পরিকল্পনা গ্রহণ

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন এবং সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপরেখা (২০১০-২০২১)" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক ও উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। তারা স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে ভূমিকা পালন করছে। ফলে সুশাসনের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

> **কাজ :** বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে, আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

৮.২ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (Main Sectors of Bangladesh Economy)

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে এবং এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত এসব শাখা বা বিভাগকে অর্থনৈতিক খাত বলে।

কৃষিখাত (Agriculture Sector)

কৃষিকাজ হচ্ছে ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কার্যক্রম। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

মৎস্য চাষ

পশুপালন

সুন্দরবন

নিম্নে কৃষিখাতের উপখাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো

ক) শস্য ও শাকসবজি

আমাদের দেশের কৃষকেরা শস্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, ডাল, আখ, তামাক, চা ও তৈলবীজ ইত্যাদি আর শাকসবজির মধ্যে আলু, শিম, লাউ, মটরশুঁটি, পটল, করলা ও বেগুন ইত্যাদি উৎপাদন করে।

খ) প্রাণিসম্পদ

আমাদের দেশে পারিবারিকভাবে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, কবুতর ও অন্যান্য পাখি পালন করা হয়। এদের মাংস, ডিম, দুধ, পালক ও চামড়া ইত্যাদি এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

গ) বনজসম্পদ

আমাদের দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় শতকরা ১১.১ ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল, যেখানে একটি দেশের থাকা উচিত মোট ভূখণ্ডের শতকরা ২৫ ভাগ। এসব বনাঞ্চলে রয়েছে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন, গর্জন, সুন্দরী, গরান, গেওয়া, গামারি, কড়াই, কুচি ও কেওড়া ইত্যাদি গাছ। এগুলো থেকে কাঠ, রাবার, গাম-তৈল, শণ, মোম ও মধু ইত্যাদি আমরা পেয়ে থাকি।

ঘ) মৎস্যসম্পদ

এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হাওর ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন- মিঠা পানির মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। মিঠা পানির মৎস্য হলো রুই, চিতল, কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি এবং সামুদ্রিক মৎস্য হলো, রূপচাঁদা, ভেটকি, লইট্যা ইত্যাদি। সম্প্রতি মৎস্য খাতে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মৎস্য খাতকে একটি পৃথক খাতের মর্যাদা প্রদান করেছেন।

কৃষিখাতের অবদান বা গুরুত্ব

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষিখাতের উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, দেশের সর্বত্র মাঠপর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণ পৌঁছানো, সহজ পদ্ধতিতে কৃষিঋণ প্রদান, কৃষিবীমার প্রচলন ও কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৪৫৪.০৪ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ সালের Labor Force Survey অনুযায়ী দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪০.৬২ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি থেকে প্রাপ্ত শণ, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এ দেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়া জনগণের প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিচের তালিকায় জিডিপিতে কৃষি ও কৃষির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপখাতের অবদানের শতকরা হার উল্লেখ করা হলো–

খাত/উপখাত	২০১৯-২০(%)	২০২০-২১(%)
১. কৃষি ও বনজ	৯.৮	৯.৪৩
ক. শস্য ও শাকসবজি	৫.৯৬	৫.৭
খ. প্রাণিসম্পদ	২.০৬	১.৯৮
গ. বনজসম্পদ	১.৭৮	১.৭৫
২. মৎস্যসম্পদ	২.৭১	২.৬৪

অতএব, ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষিখাতের অবদান ছিল ১২.৫১ শতাংশ। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরে অবদান ছিল ১২.০৭%। কৃষিখাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন : হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা।

কাজ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম–ব্যাখ্যা করো।

শিল্পখাত (Industry Sector)

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুতপ্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।

গ্যাসক্ষেত্র

একটি বিদেশি মেট্রো রেলওয়ে

জাহাজশিল্প

শিল্প খাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো :

১. খনিজ ও খনন

এ খাতের প্রধান উপখাত হলো–

ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল

খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন (কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি, গন্ধক, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু ও তামা ইত্যাদি)

২. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প

ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প : নিম্নে আলাদাভাবে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উল্লেখ করা হলো :

বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, সারশিল্প, সিমেন্টশিল্প, জাহাজ নির্মাণশিল্প, পাটশিল্প, কাগজশিল্প প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। দেশের উল্লেখযোগ্য মাঝারি শিল্প হলো, চামড়াশিল্প, তৈরি পোশাকশিল্প, সিগারেট শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প ইত্যাদি।

খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : নিম্নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প দুই ভাগে উল্লেখ করা হলো :

ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশে তৈরি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঠশিল্প, সাবানশিল্প, প্রসাধনীশিল্প এবং যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামতশিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্প।

রেশমশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, পিতল ও কাঁসাশিল্প এবং তাঁতশিল্প ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।

৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি : এ খাতের উপখাত ৩টি হলো- ক. বিদ্যুৎ, খ. গ্যাস ও গ. পানি

৪. নির্মাণ শিল্প : এই খাতে অন্তর্ভুক্ত– সেতু নির্মাণ, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ঘর-বাড়ি নির্মাণ।

উপরোক্ত চারটি খাতের সমন্বয়ে সার্বিক শিল্প খাত গঠিত।

শিল্পখাতের অবদান বা গুরুত্ব

২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩৪.৯৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ৩৬.০১% শতাংশ।

নিচের তালিকায় জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের বিভিন্ন উপখাতের অবদানের শতকরা হার দেখানো হলো–

খাত/উপখাত	২০১৯-২০(%)	২০২০-২১ (%)
১. খনিজ ও খনন	১.৯১	১.৯১
২. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প	২২.৪	২৩.৩৬
৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ	১.৩২	১.৩৫
৪. নির্মাণ	৯.৩১	৯.৪

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

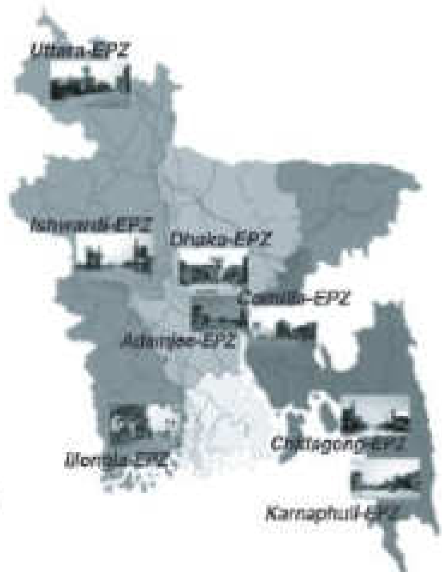

অঞ্চলভিত্তিক ইপিজেড

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি EPZ [চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী] ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫৭২টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে ৪৭০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে; এবং ১০২টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৫১৪২৬২ জন বাংলাদেশি নাগরিক সেখানে কর্মরত এবং ৪৮৮৪.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে, রপ্তানি হয়েছে ৭১৫৮২.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে সরকার শিল্পনীতি ২০১৬ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানো। উন্নয়ন রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে উঠবে, যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান হবে ৪০ শতাংশে এবং মোট কর্মসংস্থানে অবদান হবে ২৫ শতাংশ।

কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ, গৃহস্থালি, সেবা খাতসমূহ বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সরকার এ খাতে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ-সুবিধার আওতায় আনার ব্যাপারে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পূরণ করে। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। রাসায়নিক সার তৈরির কাঁচামাল রূপে, কলকারখানা, পরিবহণ ও গৃহে গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সিমেন্ট, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার উৎপাদনে চুনাপাথর; বাসনপত্র ও স্যানিটারি দ্রব্য তৈরিতে চীনামাটি; কাচ ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে সিলিকা বালু; বারুদ ও দিয়াশলাই কারখানায় এবং তেল পরিশোধনে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সার্বিক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বাণিজ্য-ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব।

কাজ : সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব - ব্যাখ্যা করো।

সেবাখাত (Service Sector)

অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যা রূপান্তরিত কাঁচামাল হিসেবে দৃশ্যমান নয়, কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, তাকে সেবা বলে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

পরিবহণব্যবস্থা

বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ণ, লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। এসব সেবা অর্থের বিনিময়ে

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ এসব সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সেবা খাত হলো একক বৃহত্তম খাত। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫১.৯২ শতাংশে। যা ২০১৯ -২০ সালে ছিল ৫২.৫৪ শতাংশ। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত উপখাতসমূহের জিডিপিতে অবদানের হার নিচের তালিকায় দেখানো হলো :

খাত	২০১৯-২০(%)	২০২০-২১(%)
১. পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.৯৭	১৫.০৬
২. হোটেল ও রেস্তোরাঁ	১.১২	১.০৯
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.৯৪	৮.৭৩
৪. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাত	৩.২৬	৩.২২
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বিমা	৮.৬৮	৮.৩৯
৬. লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৫৬	৩.৫২
৭. শিক্ষা	২.৭১	২.৬৮
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৩.২১	৩.৩২
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৫.০৩	৪.৮৫

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে অবদান সর্বোচ্চ আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত হলো পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাত যার অধীনে রয়েছে-

ক) স্থলপথ পরিবহণ

যার আওতায় সড়কপথ ও রেলপথ রয়েছে। সড়কপথের মধ্যে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়ক ২১৫৬৯ কিলোমিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার।

খ) জলপথ পরিবহণ

আমাদের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা। আর অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের জলযান দ্বারা যেমন- ফেরি সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিক সেবা অব্যাহত রেখেছে।

গ) আকাশপথ পরিবহণ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর পরিচালনা করছে। এ ছাড়া ২টি স্টল পোর্ট ব্যবহার উপযোগী রয়েছে (STOL – Short Take off and Landing)।

ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ

দেশের টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০২ সালে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি) গঠনের পর গ্রাহকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারি ২০১৭ এ গ্রাহকসংখ্যা ১২.৮ কোটি অতিক্রম করেছে।

৩,৮১৩ কিলোমিটার, আঞ্চলিক সড়ক ৪,২৪৭ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩,২৪২ কিলোমিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৮৭৭ কিলোমিটার (ব্রডগেজ ৬৫৯ কি.মি, ডুয়েল গেজ ৩৭৫ কি.মি এবং মিটার গেজ ১,৮৪৩ কি.মি.)।

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ উপখাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯৮ শতাংশ।

এ খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, উপকরণের গতিশীলতা আনয়নে, সর্বোপরি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে সার্বিক সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কাজ : বাংলাদেশের সেবা খাতের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে করো।

৮.৩ বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা-এ তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তির একটি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এ দেশে প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবা খাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো খাতই মোটামুটি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃদ্ধিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

নিচের লেখচিত্রে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার (%) উপস্থাপন করা হলো :

স্থির মূল্য বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি (ভিত্তিবছর ২০০৫-২০০৬)

*Provisional

উপরোক্ত লেখচিত্রে ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের কালীনক্রমিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে দেখানো হয়েছে যে ২০১৬-১৭ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সালে ছিল ৮.১৫ শতাংশ। ২০১৯-২০ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.২৪ শতাংশ। অর্থাৎ খুব ধীরে হলেও আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান যে তিনটি খাত অবদান রেখেছে, তা হচ্ছে, কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাত।

নিম্নের টেবিলে ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এই দুই অর্থ বছরে জিডিপি-তে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের আপেক্ষিক অবদানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে-

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপি-তে খাতওয়ারি অবদানের হার (শতাংশ)।

সার্বিক খাতসমূহ	২০১৯-২০	২০২০-২১
কৃষি	১২.৫২	১২.০৭
শিল্প	৩৪.৯৪	৩৬.০১
সেবা	৫২.৫৪	৫১.৯২
সর্বমোট	১০০	১০০

টেবিল থেকে বোঝা যায় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সাধারণভাবে প্রধান অবদান রাখছে সেবা খাত প্রায় ৫১.৯২ শতাংশ। তার পরেই রয়েছে শিল্প খাতের অবদান, প্রায় ৩৬.০১ শতাংশ। সবচেয়ে কম এবং ক্রমহ্রাসমান অবদান রাখছে কৃষি খাত প্রায় ১২.০৭ শতাংশ।

কাজ : স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান প্রদর্শন করো।

৮.৪ কৃষি ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

রমিজ একজন ধনী কৃষক। তিনি জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করেন, গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজনীয় জৈব সার ব্যবহার করে অধিক ধান উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ধান-পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি বস্তায় করে বাজারে সরবরাহ করেন। অনেকেই ঐ ধান ক্রয় করে তাদের খাদ্যের অভাব পূরণ করেন।

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা বলতে পারি, কৃষি খাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের জোগান দেয় শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আসে কৃষি খাত থেকে।

কৃষিনির্ভর শিল্প (চিনিশিল্প)

শিল্পনির্ভর কৃষি

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিচে আলোচনা করা হলো

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এ দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন- পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পপ্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে কোন কোন অঞ্চলে আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটে, যেমন- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাট শিল্প; চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চাশিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনিশিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে, যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য দুটি খাতের একই সঙ্গে উন্নতি একান্তভাবে কাম্য।

কাজ : কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করো।

[এই অধ্যায়ের প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?

২. কৃষি খাতের উপখাতসমূহ কী কী?

৩. কৃষি খাতের উপখাতসমূহের উদাহরণভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করো।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো।

২. বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৩. কৃষি খাত ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মানুষের ২০২০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী মাথাপিছু আয় কত?

ক. ১৯০৯ মার্কিন ডলার খ. ২০১২ মার্কিন ডলার

গ. ২০৬৪ মার্কিন ডলার ঘ. ২০৯৮ মার্কিন ডলার

২. বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য হলো-

i. কর্মসংস্থান বাড়ানো

ii. শিল্পক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

iii. করের পরিমাণ বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মতি তার পরিবার নিয়ে গ্রামে বসবাস করে। সেখানে গ্যাস নেই কিন্তু বিদ্যুৎ আছে। পরিবারের সকলে মিলে ঠোঙা তৈরি করে জীবনযাপন করে।

৩. মতিদের কর্মকাণ্ড কোন শিল্পের অন্তর্গত?

ক. বৃহৎ খ. মাঝারি

গ. ক্ষুদ্র ঘ. কুটির

৪. মতিলের মতো উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে-

i. সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

ii. বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে হবে

iii. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্থনীতির দুটি খাত

A (কৃষক মাঠে পাট কাটছে)

B (পাটের তৈরি ব্যাগ)

ক. শিল্প কী?

খ. আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম কেন?

গ. 'A' খাতের উন্নয়নের উপর কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'A' ও 'B' খাত পরস্পর পরিপূরক- মূল্যায়ন করো।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

Important Economic Issues of Bangladesh

বাংলাদেশ বর্তমানে মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল একটি দেশ। এ দেশের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সুষম বন্টন, মানবসম্পদের উন্নয়ন দুর্নীতি রোধ এবং সুশাসনের মাধ্যমে এই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর চিহ্নিত করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি এবং এর নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারব;
- মানবসম্পদের ধারণা বর্ণনা করতে পারব এবং
- জনসংখ্যা কীভাবে দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন (Economic Growth and Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারণা দুটি এক মনে হলেও আসলে এক নয়। এই শব্দ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধু প্রবৃদ্ধি বোঝায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি তো পায়ই, উপরন্তু অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন হয় যেমন নাগরিকদের ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

অতএব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে বুঝতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এ জন্য লেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

কাজ : প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।

৯.২ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed, Least Developed and Developing Countries)

উন্নত দেশ: উচ্চ আয়ের যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে। এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

অনুন্নত দেশ: অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস বলেন, অনুন্নত দেশ হচ্ছে সে সব দেশ, যেগুলোতে জনসংখ্যার তুলনায় মূলধন বা পুঁজি কম। নিম্ন আয়ভুক্ত এসব দেশে জনসাধারণ নিম্নমানের জীবনযাপন করে।

উন্নয়নশীল দেশ: যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম, কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। এসব দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয় এবং মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৯.২.১ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed Countries)

উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ

১. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ :** উন্নত দেশ সাধারণত পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কখনো কখনো এসব দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা থাকলেও সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ হয়। উন্নত দেশ যেমন, আমেরিকা, জাপান, ইউরোপের দেশগুলো ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণ করে আজ উন্নত বিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে।

২. **মূলধন :** উন্নত দেশে মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত। অর্থনীতিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়।

৩. **দক্ষ জনশক্তি :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ইত্যাদি পর্যাপ্ত থাকলেও যদি দক্ষ জনশক্তি না থাকে তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। উন্নত দেশ দক্ষ জনশক্তি গঠনে বিশেষ নজর রাখে। যেমন, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

৪. **উচ্চগড় আয়ুষ্কাল :** উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল সাধারণত বেশি হয়। উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে তাদের গড় আয়ুষ্কাল বেশি হয়ে থাকে।

৫. **কারিগরি জ্ঞান :** বর্তমানে উন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির মূলে রয়েছে কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি। যে দেশ কারিগরি জ্ঞানে যত বেশি উন্নত, সে দেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উন্নত দেশে মানুষ উন্নত কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশে এনেছে এবং এই প্রকৃতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করছে।

৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই, সে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। অর্থাৎ সে সব দেশে সরকারের পরিবর্তন হলেও অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা ও সুশাসন অব্যাহত থাকে।

৭. **ভৌত অবকাঠামো তথা উন্নত পরিবহণব্যবস্থা :** যেখানে ভৌত অবকাঠামো ও পরিবহণব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেখানে তত বেশি উৎপাদন ও উন্নয়ন হয়। ভৌত অবকাঠামো তথা পরিবহণব্যবস্থা উন্নত হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কাজ : উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Least Developed Countries)

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অনুন্নত। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক এসব অনুন্নত দেশে বসবাস করে।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ

১. **কম উৎপাদনশীল কৃষি খাত :** অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি সনাতনী।

২. **কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি :** এসব দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে।

৩. **বেকারত্ব :** অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ায় ছদ্মবেশী ও মৌসুমি বেকারত্ব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৪. **কম মাথাপিছু আয় :** অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়।

৫. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র :** অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।

৬. **জনসংখ্যাধিক্য :** বেশির ভাগ অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় কম। জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, যানবাহন, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে করা যায় না।

৭. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** অনুন্নত দেশ প্রযুক্তি ও কৌশল পরিবর্তন করে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেগবান হয় না।

৮. **অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণব্যবস্থা :** অনুন্নত দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত থাকে। ফলে মালামাল স্থানান্তরে বিঘ্ন ঘটে। উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না।

৯. **প্রতিকূল বাণিজ্যশর্ত :** অনুন্নত দেশগুলো শিল্পে উন্নত না থাকায় এসব দেশ কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল, প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। যেসব কৃষিপণ্য উপকরণ হিসেবে কম মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করে, সেই কৃষিপণ্য শিল্পপণ্যে রূপান্তরিত হয়ে অধিক মূল্যে এসব দেশে আমদানি করা হয়। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে।

১০. **অনুন্নত শিল্প কাঠামো :** অনুন্নত দেশে শিল্প কাঠামো সেকেলে এবং বৃহদায়তন মূলধনি শিল্প খুব কম। অনুন্নত দেশের শিল্প খাতে অন্যান্য খাতের তুলনায় শ্রমিক নিয়োগ কম এবং শ্রমিকদের দক্ষতাও কম।

কাজ : উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত দেশের তুলনা করো।

উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developing Countries)

উন্নয়নশীল দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

১. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি :** দেশের অধিকাংশে মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। কৃষিক্ষেত্রে পুরনো আমলের জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারে চাষাবাদ হয়, তবে এখানেও কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষিতে বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব থাকে।

২. **মাথাপিছু আয় :** উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম কিন্তু অনুন্নত দেশের তুলনায় বেশি। ফলে জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত নয়।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** অধিকাংশে উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না।

৪. **মূলধনের স্বল্পতা :** উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। কম সঞ্চয় মূলধন গঠনের পথে অন্তরায়।

৫. **প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ :** উন্নয়নশীল দেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক পণ্য বলতে শিল্পের কাঁচামাল যেমন, পাট, চামড়া ইত্যাদি বোঝায়।

৬. **শিল্পের বিকাশ :** উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিল্প প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও রপ্তানিমুখী শ্রমঘন শিল্পের দ্রুত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

৭. **বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি :** উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবছর রপ্তানির মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় আসে, তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানির মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে এ দেশগুলোকে প্রতি বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।

৮. **উদ্যোক্তার অভাব :** উন্নয়নশীল দেশে পণ্যসামগ্রী বেশির ভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত। এসব পণ্যের মূল্যের উত্থান-পতন হয় বেশি। পণ্যের মূল্য উত্থান-পতন হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৯. **অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল :** উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহন, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় কম।

১০. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা :** উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনেকাংশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

কাজ : বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের, নির্ধারণ করো।

৯.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Obstacles to Economic Development of Bangladesh)

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না।

১. **কৃষির উপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মন্থর।

২. **অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। কৃষিপণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল।

৩. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম থাকায় সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

৪. **উদ্যোক্তার অভাব :** উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সক্ষম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তার অভাবের কারণে প্রাপ্ত সঞ্চয় ও মূলধন উৎপাদনী খাতে কম ব্যবহার হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ না থাকার কারণে উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে না। বিদেশমুখীনতার কারণেও অনেক পুঁজি বাইরে চলে যায়।

৫. **অধিক জনসংখ্যা :** বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা সম্পূর্ন ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাতীয় উৎপাদনের বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর ভোগের জন্য ব্যয় হয় ফলে সঞ্চয় কম হয়। আর সঞ্চয় ও পুঁজির স্বল্পতা উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করে।

৬. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র :** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। অধ্যাপক নার্কসের মতে, একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দেশ দরিদ্র। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো উৎপাদন কম, আয় কম চাহিদা ও সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম উৎপাদন কম।

৭. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতা রয়েছে। যেমন : হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদি। এ অবস্থা অধিকতর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও এতে ব্যাহত হয়।

৮. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা ও নানা শর্তের কারণে বাংলাদেশ প্রায়শ প্রতিকূল বাণিজ্য-শর্তের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিদেশিদের প্রভাব আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। তবে সম্প্রতি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি এবং প্রচুর রেমিট্যান্সের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা ক্রমহ্রাসমান।

৯. **অনুন্নত বাজারব্যবস্থা :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্র বাজারব্যবস্থা এখনো যথেষ্ট উন্নত হয়নি। সচেতনতার অভাব, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থায়নের অভাব এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণে বাজার দাম সকল ক্ষেত্রে উৎপাদকের জন্য লাভজনক হয় না।

১০. **প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা :** উন্নত প্রযুক্তির অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল এবং ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায় না।

কাজ : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

৯.৪ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম (Development Programmes of Non-government Organisations)

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও কাজ করছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান এনজিও হচ্ছে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস ও ব্যুরো বাংলাদেশ।

১. **ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি):** ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংস্থাটি দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ বস্তিতে কাজ করে থাকে।

২. **স্বনির্ভর বাংলাদেশ :** স্বনির্ভর বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। শুরুতে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত সেল হিসেবে কাজ করে। বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ শুরু করে ১৯৮৫ সালে।

৩. **প্রশিকা :** ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশসম্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসতবাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রম চালাচ্ছে।

৪. **আশা (এসোসিয়েশন্স ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট) :** আশা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৫. **শক্তি ফাউন্ডেশন :** ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুস্থ নারীদের এ সংস্থা ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব নারীদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে।

৬. **টিএমএসএস (ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ) :** বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন। এই সংগঠন নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নারীদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

৭. **এসএসএস (সোসাইটি ফর সোশাল সার্ভিসেস) :** সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।

৮. **ব্যুরো বাংলাদেশ :** এই সংস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পানি/পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৯.৫ দারিদ্র্য (Poverty)

দারিদ্র্য দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সুতরাং দারিদ্র্যের ধারণা, পরিমাপ, প্রবণতা এবং কীভাবে দারিদ্র্য নিরসন করা যায়, সে বিষয়ে জানা দরকার।

দারিদ্র্যের ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্য একটি বহুমুখী আপেক্ষিক বিষয় (Multidimensional and Relative). সমাজে যারা অন্যদের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে কম আয় করেন, কম ভোগ করেন, কম সম্পদের মালিক, কম শান্তিতে আছেন এবং সর্বদাই নিজেদেরকে অ-ক্ষমতাবান ও বিপন্ন বোধ করেন, তাদেরকেই সাধারণত দরিদ্র বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে আমরা তাদেরকেই দরিদ্র বলে থাকি, যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণটুকু জোগাড় করতে পারেন না। সেরকম ন্যূনতম আয়সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে দরিদ্র পরিবার হিসেবে ধরা হয়। দরিদ্রদের মধ্যে যারা আরো হত দরিদ্র, তাদেরকে চরম দরিদ্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিচের তালিকায় বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিমাপ, হার ও গতিপ্রবণতা তুলে ধরা হলো।

সারণি-১

ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৯৫/৯৬	২০০৫	২০১০	২০১৬
দারিদ্র্য	জাতীয়	৪৭.৫	৪০.৪	৩১.৫	২৪.৩
	পল্লি	৫৭.১	৩৯.৫	৩৫.২	২৬.৪
	শহর	৪৯.৭	৪৩.২	২১.৩	১৮.৯
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	২৫.১	১৯.৫	১৭.৬	১২.৯
	পল্লি	২৪.৬	১৭.৯	২১.১	১৪.৯
	শহর	২৭.৩	২৪.৪	৭.৭	৭.৬

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গতিধারা (Poverty Trends of Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত (non-food) ভোগ্যপণ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলত বিবিএস পরিচালিত আয় ও ব্যয় জরিপ ১৯৯৫/৯৬, ২০০৫, ২০১০ এবং ২০১৬-এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশে নেমে আসে অর্থাৎ দারিদ্র্য গড় বার্ষিক ৪.২৩ পয়েন্ট শতাংশ হারে (Point Percentage Rate) হ্রাস পায়। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে ৪.৭ শতাংশ হারে।

দারিদ্র্য নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম (Programmes Adopted for Poverty Alleviation)

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য নিরসনের আওতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্যনিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল।

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

(ক) নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);

(খ) নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);

(গ) খাদ্যনিরাপত্তা কার্যক্রম;

(ঘ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

ক. নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রমসমূহ (বিভিন্ন ভাতা)

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ বয়স্ক জনগণ এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ নারী। তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সরকার বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ নারী ভাতা চালু করেছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালু করেছে।

খ. নগদ অর্থসহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ)

বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিছু বিশেষ নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চালু আছে। এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা এবং দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এ ধরনের কার্যক্রম।

গ. খাদ্যনিরাপত্তা কার্যক্রম

দারিদ্র্য নিরসনে খাদ্যনিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিএফ কর্মসূচি এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিজিডি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

ঘ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি উপায় হলো আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া সমবায় সমিতি গঠন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৯.৬ বেকারত্ব (Unemployment)

বেকারত্বের সংজ্ঞা (Definition of Unemployment)

কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না–এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। একজন বেকারের মধ্যে নিচের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

(১) মজুরিভিত্তিক কোনো কাজ পায় না,

(২) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক,

(৩) আয় উপার্জন থেকে বঞ্চিত,

(৪) আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

বেকারত্বের প্রকৃতি (Types of Unemployment)

১. **মৌসুমি বেকারত্ব :** প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে এ ধরনের বেকারত্ব হয়। যেমন- ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।

২. **ছদ্মবেশী/প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব :** কৃষি খাতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে। যেমন ধরা যাক, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। সে একাই ঐ জমিতে চাষবাস করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। এখন যদি তার দুই ছেলে বাবার সঙ্গে ঐ জমিতে চাষের কাজে নিযুক্ত হয়, তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে ঐ কৃষক একা যা উৎপাদন করত, দুই ছেলেসহ উৎপাদনের পরিমাণ একই হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অতিরিক্ত দুজন লোকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। এর কারণ হলো তিনজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে নিচ্ছে। সুতরাং এই দুজন শ্রমিককে প্রচ্ছন্ন বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব হলো সেই অবস্থা, যেখানে শ্রমিক আপাতদৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য।

৩. **সাময়িক বেকারত্ব :** পেশা পরিবর্তনের সময়ে যে বেকারত্ব তৈরি হয়, তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলা হয়। যেমন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এ সময় যে কয় দিন সে কর্মহীন থাকে, এ সময়কালটা সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজ কম থাকায় উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা দেয়।

বেকারত্ব নিরসন (Reduction of Unemployment)

বেকার সমস্যা সমাধান করতে কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার উন্নতি, বহু ফসলি চাষাবাদ এবং কৃষিভিত্তিক নানা কাজকর্ম যেমন– গবাদি পশু পালন, বনায়ন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অকৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, খাল সংস্কার, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, ছোটখাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব ছাড়াও বেকারত্ব নিরসনের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়।

১. **ছদ্মবেশী বেকারত্ব নিরসন :** অনুন্নত দেশের কৃষিব্যবস্থায় ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। কৃষি খাতের শ্রমিকের মজুরির চেয়ে শিল্প খাতে শ্রমিকের মজুরি বেশি প্রদান করলে শিল্প খাতে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পায়। আর কৃষি খাত থেকে উদ্বৃত্ত বেকার শ্রমিক শিল্প খাতে স্থানান্তর হয়। এই পদ্ধতিতে আমরাও বাংলাদেশে ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর করতে পারব।

২. **মূলধন বিনিয়োগ ও বেকারত্ব নিরসন :** উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব নিরসনে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ দ্বারা প্রথমে শিল্পের উন্নয়ন ও পরবর্তী সময়ে শিল্পের যান্ত্রিক কৌশলগত উন্নয়ন করলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বাংলাদেশেও বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

৩. **কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন :** কৃষি খাতে যে সকল ছোট যন্ত্রপাতির দরকার হয় এগুলো কৃষিভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত করা যায়। আর এ ধরনের শিল্প গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করা যায়।

৪. **গ্রামীণ ব্যবস্থায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন :** কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে একদিকে শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। মোট কথা দেশের বেকারত্ব নিরসন হবে।

৫. **কৃষিজমিতে বহু ফসল উৎপাদন-ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় মৌসুমি ফসল ব্যতীত মাঝখানে অন্য ফসল উৎপাদন বা কৃষিজমিতে একটি ফসল উত্তোলনের পর অন্য ফসল করার উদ্যোগ নিলে কৃষি শ্রমিক বেকার থাকবে না।

৬. **ফসলবহির্ভূত কৃষি :** বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে নদী-নালা, খাল-বিল, নিচু জমি রয়েছে। এসব জায়গায় বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষ করা যায়। আর উঁচু অথচ ফসল হয় না এমন জায়গায় হাঁস-মুরগির খামার করে বছরের সব সময় কাজ করার সুযোগ হয়।

৭. **অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে কর্মমুখী বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করে স্বল্প শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থায় কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

৮. **পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণসুবিধা :** গ্রামীণ অর্ধশিক্ষিত বেকারদের ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদানের পর তাদেরকে আর্থিক ঋণসুবিধা প্রদান করলে হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, গবাদি পশু খামারের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যায়। আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেও গ্রামীণ বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।

অনুসন্ধান কাজ : তোমার এলাকার বেকারত্ব পরিস্থিতির উপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করো।

৯.৭ মানবসম্পদ (Human Resource)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। কাজেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

মানবসম্পদের সংজ্ঞা (Definition of Human Resource)

জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয়, তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে। তবে কোনো দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ বলে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবশক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদ ও মানবসম্পদ এ দুটিই জরুরি। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মানবসম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি (Methods of Human Resource Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে নিচের পদ্ধতিসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. **শিক্ষা** : জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে সকলের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একজন মানুষ নিরক্ষর থাকতে পারে কিন্তু তাকে কর্মমুখী শিক্ষাদান করলে তার মানবশক্তির উন্নয়ন হয়। একজন নিরক্ষর মানুষ ভালো ও দক্ষ চাষি হয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পেশাগত শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। এ উদ্দেশ্যে দেশের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি করা দরকার। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোক তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে।

২. **প্রশিক্ষণ** : দেশের শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত জনবল অধিক উৎপাদনে সক্ষম। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক উন্নত প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে।

৩. **জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন :** সুষম খাদ্য গ্রহণ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। দেশের সব নাগরিককে এ অপরিহার্য উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো দরকার। দেশের যেসব মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও কর্মবিমুখ, তাদের যেকোনো মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়।

৪. **খাদ্য ও পুষ্টি :** দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে সুষম খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতন করে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, কৃষক, শ্রমিকসহ প্রত্যেকেরই দেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার।

৫. **উপযুক্ত বাসস্থান :** স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ বাসস্থান মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং পরিকল্পিত উপায়ে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাষ্ট্র থেকে করতে হবে।

৬. **নারীর ক্ষমতায়ন :** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী সমাজকে কর্মে নিয়োজিত করার উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদেরকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব।

৭. **মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা :** বাংলাদেশের জনগণের কর্মদক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ মানবসম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

[এই অধ্যায়ের যাবতীয় তথ্যের উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও।

২. প্রবৃদ্ধি কি উন্নয়নের অংশ? বুঝিয়ে লেখো।

৩. অনুন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪. উন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ কী কী?

৬. কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম উল্লেখ করো।

৭. বেকারত্বের ধারণা দাও।

৮. বেকারত্ব নিরসনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করো।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা করো।

২. উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? বর্ণনা করো।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বর্ণনা করো।

৪. দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৫. বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতিসমূহের ধারণা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উন্নয়ন কী?

ক. প্রবৃদ্ধির একটি অংশ খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

গ. জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘ. প্রবৃদ্ধির সাথে অন্যান্য বিষয়ের সুফল

২. কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতার ফলে–

i. কৃষক উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করে

ii. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়

iii. জীবননির্বাহী ক্ষুদ্র খামারের প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

করিম একটি ভাড়া করা স্কুটার চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তাঁর সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি স্কুটার কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি স্কুটার ক্রয় করেন।

৩. করিমের অবস্থাটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত?

ক. দারিদ্র্যের গতিধারা খ. দারিদ্র্য বিমোচন

গ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ঘ. দারিদ্র্য হ্রাস

৪. নতুন স্কুটার ক্রয়ের মাধ্যমে করিমের

i. বেকারত্ব দূর হবে

ii. মূলধন গঠিত হবে

iii. ভোগ বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

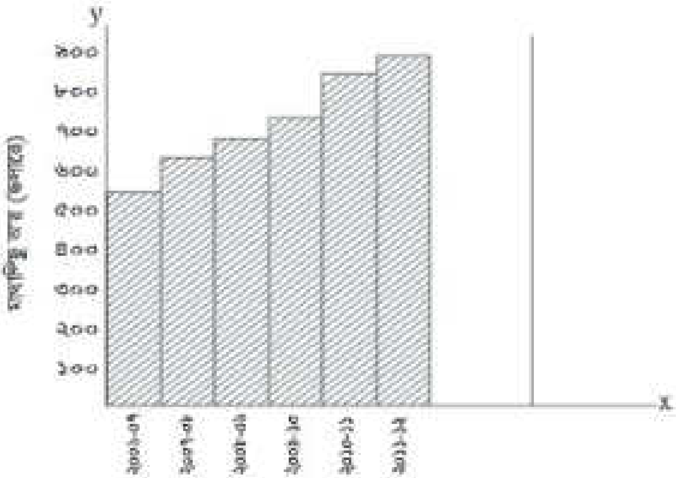

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে?

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

গ. লেখচিত্রে কোন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. লেখচিত্রে প্রদর্শিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য কোন নিয়ামক শক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো।

২. তামান্না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেছে। তার এখনও কোনো চাকরি হয়নি। ইদানীং সে তার মায়ের পরিচালিত হস্তশিল্পে তার মাকে কাজে সাহায্য করে। মায়ের কাছে থেকে তার সময় ভালো কাটে কিন্তু তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বা আয় পূর্বের অবস্থায় রয়েছে।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে?

খ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা করো।

গ. অর্থনীতিতে তামান্নার কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা' তামান্নাকে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে– মূল্যায়ন করো।

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা

The Public Finance of Bangladesh Government

বাংলাদেশ সরকারের দেশের প্রশাসন পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থসংস্থানের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ আয় করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীকে বাজেট বলে। আর এসব বিষয়ের আলোচনা সরকারি অর্থব্যবস্থায় হয়ে থাকে।

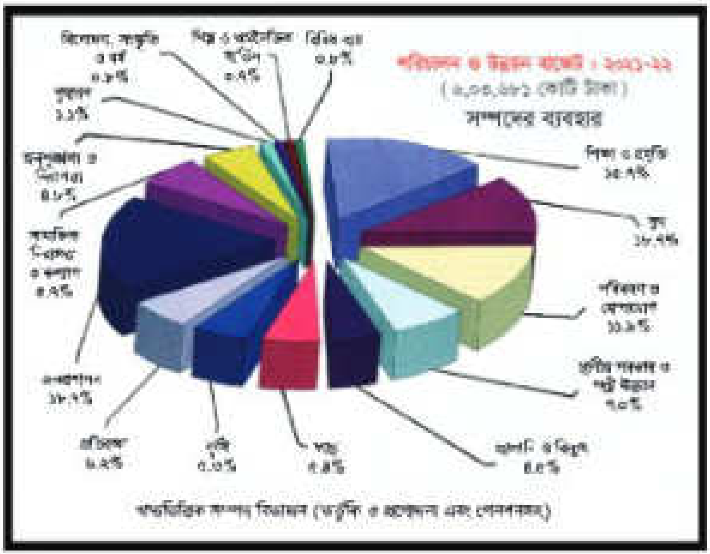

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- বাজেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- সুষম বাজেটের সাথে অসম বাজেটের তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ও এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব এবং
- জাতীয় বাজেটের আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহী হতে পারব।

১০.১ সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance)

অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। একটি দেশের জনসাধারণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সরকার কোন কোন খাতে, কীভাবে, কোন নীতিতে ব্যয় করবে, তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়। সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য কীভাবে, কোন কোন উৎস হতে আয় করবে অথবা কোন উৎস থেকে কতটুকু ঋণ গ্রহণ করবে, তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

১০.২ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ একটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা, দেশ রক্ষা ইত্যাদি কাজে সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস প্রধানত দুটি। যথা- ক) কর রাজস্ব, খ) করবহির্ভূত রাজস্ব।

ক) কর রাজস্ব (Tax Revenue)

সরকার জনগণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে কিন্তু তার বিনিময়ে জনগণ সরকার থেকে সরাসরি বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা আশা করতে পারে না, তাকে কর বলে। সরকার দেশের নিবাসী বা অনিবাসী ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং পণ্যের উপর যে কর ধার্য করে, তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে কর রাজস্ব বলা হয়।

রাজস্ব ভবন

সরকারের কর রাজস্বের উৎসসমূহ হলো–

১. আয় ও মুনাফার উপর কর (Taxes on Income and Profit)

কোনো ব্যক্তির বা কোম্পানির আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি অন্যতম উৎস হলো আয়কর। বর্তমানে বাংলাদেশে কোম্পানি ব্যতীত ব্যক্তিগত করদাতা যাদের বার্ষিক নীট আয় ৩,০০,০০০ টাকা (পুরুষদের ক্ষেত্রে); ৩,৫০,০০০ টাকা (মহিলাদের এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বছরের পুরুষদের ক্ষেত্রে); ৪,০০,০০০ টাকা (প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) এবং ৪,৭৫,০০০ টাকা হলে (মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে) তাদের আয়ের উপর আয় কর ধার্য করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির মুনাফার উপর কর ধার্য করা হয়ে থাকে।

২. মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax)

অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax- VAT) বলে।

বর্তমানে আমাদের দেশে আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খাতের আওতা আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

৩. আমদানি শুল্ক (Custom Duties)

বাংলাদেশে সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হলো আমদানি শুল্ক। দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের ও সেবার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে।

৪. আবগারি শুল্ক (Excise Duties)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের উপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

৫. সম্পূরক শুল্ক (Supplementary Duties)

বিভিন্ন কারণে সরকার অনেক দ্রব্যসামগ্রীর উপর আবগারি শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর বা আমদানি শুল্ক আরোপের পরেও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করে, তাকে সম্পূরক শুল্ক বলে। যেমন, সিরামিক টাইলসের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক।

৬. অন্যান্য কর ও শুল্ক (Other Taxes and Duties)

উপরের শুল্ক ও করের মূল পাঁচটি উৎস ছাড়াও আরও কিছু কর ও শুল্ক থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে। যেমন : সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি।

৭. মাদক শুল্ক (Narcotics and Liquor Duty)

মাদকজাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর সরকার শুল্ক বসিয়ে অর্থ আয় করে থাকে। এর মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

৮. যানবাহন কর (Tax on Vehicles)

বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের উপর যে কর দেওয়া হয়, তাকে যানবাহন কর বলে। এ খাত থেকে সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ আয় করে থাকে।

৯. ভূমি উন্নয়ন কর (Land Development Tax)

ভূমির মালিকানা ও ভোগদখলের জন্য ভূমির মালিক সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। বাংলাদেশ সরকার ভূমির উপর উন্নয়ন কর আরোপ করেছে।

১০. নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (Non-Judicial Stamp)

দলিলপত্র ও মামলা-মোকদ্দমার আবেদনপত্র ব্যবহারের জন্য নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়। এ খাত হতে সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ আয় করে।

খ) করবহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)

সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া আরও অনেক উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে করবহির্ভূত রাজস্ব বলে।

সরকারের করবহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

১. লভ্যাংশ ও মুনাফা (Dividend and Profit)

সরকার তার মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পার্ক, চিড়িয়াখানা) থেকে বছরান্তে লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে।

২. সুদ (Interest)

সরকার, সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। প্রদত্ত ঋণের সুদ হিসেবে সরকার প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে।

৩. প্রশাসনিক ফিস (Administrative Fees)

সরকার জনগণকে প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফি আদায় করে থাকে। যেমন– কোর্ট ফিস।

৪. জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (Fine, Penalty and Confiscation)

দেশের আইন ও নিয়মনীতি পরিপন্থি বিভিন্ন কাজের জন্য সরকার জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ করে প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে।

৫. অর্থনৈতিক সেবা (Economic Services)

সরকার তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রপ্তানি আইনের আওতায় প্রাপ্ত ফিস, বাণিজ্য সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিমা আইনের আওতায় প্রাপ্তি ও সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফিস, সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফিস ইত্যাদি।

৬. ভাড়া ও ইজারা (Rent and Lease)

সরকারি বিভিন্ন সম্পত্তি ভাড়া ও ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ আয় করে থাকে। যেমন : হাট, ঘাট।

৭. টোল ও লেভি (Toll and Levy)

বিভিন্ন সেতু থেকে টোল ও লেভি আদায় বাবদ সরকার কিছু অর্থ আয় করে থাকে।
যেমন : সেতুর জন্য টোল আদায়।

৮. অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় (Non Commercial Sales)

সরকার জনগণের কল্যাণে কোনো কোনো সময় বিনা লাভে অনেক দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে। যেমন : ও.এম.এস বা খোলা বাজার বিক্রয় নীতি।

৯) রেলওয়ে (Railway)

বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীবহণ ও দ্রব্যসামগ্রী পরিবহণের ভাড়া বাবদ আয় করে। রেলওয়ে সেবাকে সম্প্রসারণ, আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে এ খাতে মুনাফার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০) ডাক বিভাগ (Postal Department)

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটি সরকারের আয়ের একটি উৎস। ডাক বিভাগ বর্তমানে বহুমুখী সেবা প্রদান করার ফলে এ খাতে আয় প্রবাহ কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

উপরে উল্লিখিত বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তাই প্রতিবছর সরকারকে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদেশি ঋণ, সাহায্য, দান, অনুদান এসবের উপর নির্ভর করতে হয়।

কাজ ১ : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করো।
কাজ ২ : বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায় চিহ্নিত করো।

১০.৩ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ একটি নিম্নমধ্যম আয়ের জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশ রক্ষা ও পরিচালনা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। গণতন্ত্রের উন্মেষ ও উন্নয়নের ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে অনেক নতুন নতুন খাতও ব্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

১. শিক্ষা ও প্রযুক্তি

সরকার মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তিসংখ্যা ও হার বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। শিক্ষার সাথে প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে।

২. প্রতিরক্ষা

দেশকে বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, বেতন-ভাতা, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রভৃতি প্রদানের জন্য সরকার এ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এ খাতে অনেক ব্যয় বরাদ্দ অপ্রকাশিত থাকে।

নৌ-তরি

৩. জনপ্রশাসন

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে জনপ্রশাসন পরিচালনা করতে হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং অফিস পরিচালনা বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

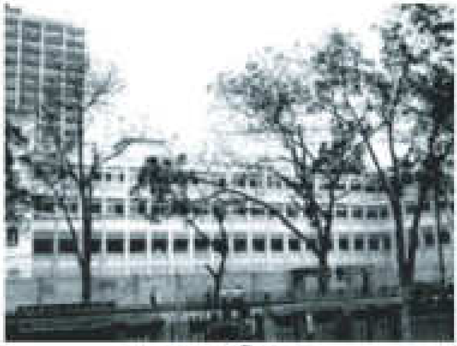

বাংলাদেশ সচিবালয়

৪. জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে ও পরিচালনা করতে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৫. কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষি গবেষণা

বাংলাদেশ সরকার কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং ঋণ বিতরণ করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রথম কৃষি গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেওয়া শুরু করেছে।

কৃষিকাজ

৬. জনস্বাস্থ্য

জনগণের সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, মহামারী প্রতিরোধ, ডাক্তার ও নার্সের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। চিকিৎসাসেবা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন এবং সেখানে একজন করে এম.বি.বি.এস ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়েছে। যার ফলে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশ সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি, যেমন : বয়স্কভাতা কর্মসূচি, বিধবাভাতা, এসিডদগ্ধ নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্ব নিরসন, তৈরি পোশাকশিল্পের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এবং বাস্তুহারা গৃহায়ণ তহবিল, একশ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার এবং গরিব-দুস্থদের মাঝে রেশনিং কাজে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৮. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন বৃদ্ধিকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন তহবিল গঠন প্রভৃতি খাতে প্রতিবছর সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

৯. পরিবহণ ও যোগাযোগ

বাংলাদেশের যাতায়াত, যোগাযোগ ও পরিবহণব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার যোগাযোগ, সড়ক, রেলপথ, নৌপরিবহণ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সেতু বিভাগের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

১০. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান

'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দুই বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বল্প শিক্ষিত, কর্মঠ ও বেকার যুবকদের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নানারূপ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), খয়রাতি সাহায্য (জিআর), ভিজিএফ ও ভিজিডি বাবদ প্রতিবছর সরকার ১০ লাখ মেট্রিক টনের অধিক খাদ্যশস্য বিতরণ করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করছে। এসব খাতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১১. ঋণ ও সুদ পরিশোধ

সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে। এসব ঋণ এবং ঋণের সুদ পরিশোধ করতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১২. শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ

দেশের শিল্প এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এই ব্যয় করে থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পুন-অর্থায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বস্ত্রশিল্প

১৩. পরিবেশ ও বন

পরিবেশ সংরক্ষণ-মানোন্নয়ন, শিল্পদূষণ থেকে রক্ষা, তরল বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ইত্যাদি নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ ব্যয় করে।

১৪. বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

সরকার দেশের তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে প্রতিবছর অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে।

১৫. স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরও কয়েকটি খাতে ব্যয় করে, যেমন- মহিলা ও শিশু, পানিসম্পদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, গৃহায়ণ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব ব্যয় প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা (২০২২)।

২০২৫

অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৫৫টি খাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর প্রায় ১৮টি খাতে ব্যয় করে থাকে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র ধারণার আলোকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে, অনুন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস করে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিধি আরও প্রসারিত করা উচিত।

কাজ ১ : বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারি অর্থ বরাদ্দের তালিকা তৈরি করো।
কাজ ২ : সাম্প্রতিক কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করো।

১০.৪ বাজেট (Budget)

বাজেট বলতে আয় ও ব্যয়ের সুবিন্যস্ত হিসাবকে বোঝায়। ব্যক্তি তার বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় পায় তা কীভাবে ব্যয় করে তা যদি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়, তা হবে ব্যক্তিগত বাজেট। একইভাবে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে কতটুকু আয় প্রাপ্তির আশা করে এবং বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করতে চায়, তার সুবিন্যস্ত হিসাবকে সরকারি বাজেট বলে। বাংলাদেশে আর্থিক বছর হলো জুলাই থেকে জুন।

বাজেট হলো সরকারি অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। বাজেটে যেমন সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে, তেমনি দেশের অর্থনীতির চিত্র ফুটে ওঠে। বাজেটে কেবল সরকারি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবই থাকে না; বরং আয় ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কীভাবে ঘাটতি পূরণ হবে এবং ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে সে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কী করা হবে ইত্যাদি বিষয়ও বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদে অনুমোদন নিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে সরকারের নির্ধারিত আয়-ব্যয় ও তার পদ্ধতি কার্যকর হয়।

বাজেটের প্রকারভেদ

সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

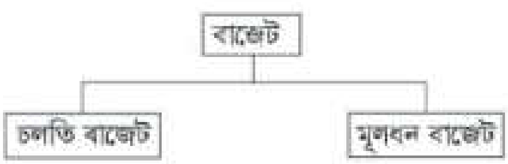

চলতি বাজেট (Current Budget)

যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে চলতি বাজেট বলে। চলতি আয় সংগৃহীত হয় কর রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব হতে। কর রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মূল্য সংযোজন কর, আয়কর, সম্পত্তি কর ও ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। করবহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা, ঋণের সুদ ইত্যাদি। বাজেটের এ অর্থ ব্যয় হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দেশ রক্ষার জন্য। এ বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো যেমন- শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেহেতু এ খাতগুলো অপরিবর্তিত থাকে, তাই প্রতিবছর বাজেটে এ ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। চলতি বাজেট সাধারণত উদ্বৃত্ত থাকে। চলতি বাজেটকে অ-উন্নয়ন বা রাজস্ব বাজেটও বলা হয়।

মূলধন বাজেট (Capital Budget)

সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হলো– রাজস্ব উদ্বৃত্ত, বেসরকারি সঞ্চয় ব্যাংক ঋণ ও অতিরিক্ত কর ধার্য করা ইত্যাদি। আর বৈদেশিক আয়ের উৎস হলো–বৈদেশিক ঋণ, বৈদেশিক অনুদান ইত্যাদি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

কাজ : চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় করো।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দিক থেকে বাজেটকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

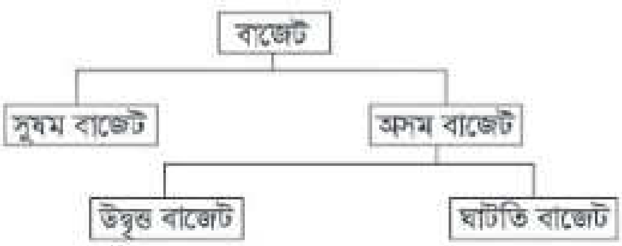

১. সুষম বাজেট (Balanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির

সম্ভাবনা কম থাকে, যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে । তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে এটি সহায়ক নয়।

সূত্র :

সুষম বাজেটে = মোট আয়-মোট ব্যয় = ০ হয়।

অর্থাৎ, মোট আয় = মোট ব্যয় ।

২. অসম বাজেট (Unbalanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে । সরকারের আয় ও ব্যয়ের অসমতার দিক থেকে অসম বাজেটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-

ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে, তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে । অর্থাৎ, এ বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ বেশি ।

সূত্র : উদ্বৃত্ত বাজেটে = (মোট আয় - মোট ব্যয়) > ০ হয়।
অর্থাৎ মোট আয় > মোট ব্যয়

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে । সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে ।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক । তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে ।

সূত্র : ঘাটতি বাজেটে = (মোট আয় - মোট ব্যয়) < ০ হয়।

অর্থাৎ, মোট আয় < মোট ব্যয় ।

কাজ ১ : উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় করো।
কাজ ২ : সুষম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

১০.৫ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আর্থিক বছর জুলাই- জুন। প্রতিবছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে পরবর্তী বছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করেন, যা আলোচনা, সমালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজনের পর উক্ত মাসেই মহান সংসদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

জাতীয় সংসদ

আমাদের দেশে বাজেটকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। যথা-

১) অ-উন্নয়ন বাজেট বা চলতি বাজেট বা রাজস্ব বাজেট।

২) উন্নয়ন বাজেট বা মূলধন বাজেট।

১) অ-উন্নয়ন বাজেট (Non-Development Budget)

বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন বা চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তাকে অ-উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশ রক্ষা এবং দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় এ বাজেটে উল্লেখ থাকে না।

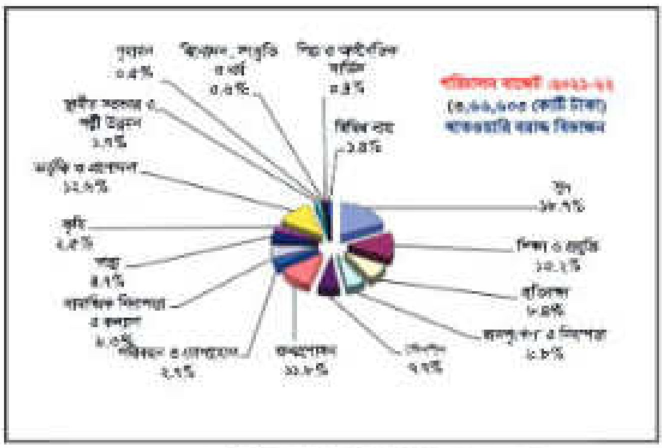

অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ

অ-উন্নয়ন বাজেটের আয় সংগৃহীত হয় মূলত কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব হতে। আয়ের উৎসগুলো নিম্নরূপ :

কর থেকে আয়	করবহির্ভূত আয়
আয় ও মুনাফার উপর কর	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে লভ্যাংশ ও মুনাফা
মূল্য সংযোজন কর (VAT)	সুদ থেকে প্রাপ্ত
আমদানি শুল্ক	প্রশাসনিক ফি
আবগারি শুল্ক	জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ
সম্পূরক শুল্ক	সেবা বাবদ প্রাপ্তি
ভূমি রাজস্ব	ভাড়া ও ইজারা
যানবাহন কর	টোল ও লেভি
স্ট্যাম্প বিক্রয়	রেলওয়ে
নন-জুডিশিয়াল মাদক শুল্ক	ডাক বিভাগ
অন্যান্য কর ও শুল্ক	তার ও টেলিফোন বোর্ড
	অন্যান্য করবহির্ভূত রাজস্ব

অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ	
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	সামাজিক নিরাপত্তা
জনপ্রশাসন	ঋণ ও সুদ পরিশোধ
প্রতিরক্ষা	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
পরিবহণ ও যোগাযোগ	অপ্রত্যাশিত ব্যয়

২) উন্নয়ন বাজেট (Development Budget)

বাজেটের যে অংশে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে উন্নয়নমূলক বা মূলধন বাজেট বলে। এ বাজেটে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং অর্থসংস্থানের উৎসের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। উন্নয়ন বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন। তাই প্রতিবছর নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নিতে হয়।

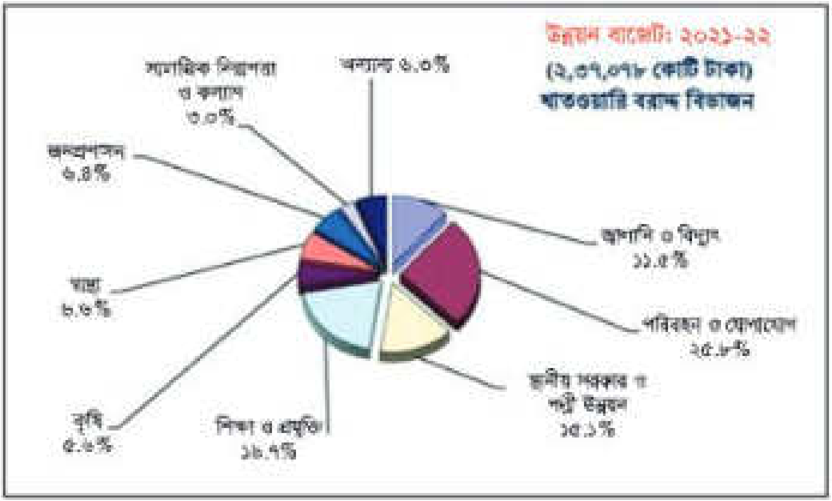

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ :

আয়ের উৎসসমূহ	ব্যয়ের খাতসমূহ
অভ্যন্তরীণ উৎস :	১. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন
১. অ-উন্নয়ন বাজেটের উদ্বৃত্ত	২. স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন
২. অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে আয়	৩. পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন
৩. অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং-ব্যবস্থা হতে ঋণ	৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
৪. বন্ডের মাধ্যমে ঋণ	৫. শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন
বৈদেশিক উৎস :	৬. পানিসম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ
১. বৈদেশিক সাহায্য	৭. গৃহায়ণ
২. বৈদেশিক ঋণ	৮. শ্রম ও জনশক্তি
	৯. মহিলা ও যুব উন্নয়ন
	১০. অন্যান্য

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোনটি অ-উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন বাজেটের অংশ তা নির্ণয় করো।

১০.৬ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেট : ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট এবং বিগত অর্থবছরের (২০২০-২১) সংশোধিত বাজেট :

এক নজরে বাজেট

(অর্থসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট (২০২১-২২)	সংশোধিত বাজেট (২০২০-২১)
ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	৩৪৬০০০	৩১৬০০০
খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবর্হিভূত করসমূহ	৪৩০০০	৩৫৫৩২
গ. বৈদেশিক অনুদান	৩৪৯০	৩৯৮৫
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ)	৩৯২৪৯০	৩৫৫৫১৭
ক. অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৩৬১৫০০	৩২৩৬৮৮
খ. উন্নয়ন ব্যয়	২৩৭০৭৮	২০৮০২৫
গ. অন্যান্য ব্যয়	৫১০৩	৭২৭০
মোট ব্যয় (ক+খ+গ)	৬০৩৬৮১	৫৩৮৯৮৩
সামগ্রিক ঘাটতি (আয়-ব্যয়)	(-) ২১১১৯১	(-) ১৮৩৪৬৬
ক. বৈদেশিক উৎস (ঋণ)	৯৭৭৩৮	৬৮৪১৪
খ. অভ্যন্তরীণ উৎস (ঋণ)	১১৩৪৫৩	১১৫০৫২
মোট অর্থসংস্থান (ক+খ)	২১১১৯১	১৮৩৪৬৬

[বাজেটের উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ২০২১-২২]

এ বাজেট প্রধানত দুটি অংশ রয়েছে। যথা- অনুন্নয়ন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। আয় ব্যয়ের ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান বাজেট হলো ঘাটতি বাজেট।

কাজ : বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

[এই অধ্যায়ের প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০]

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

২. মূল্য সংযোজন কর বলতে কী বোঝায়?

৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়?

৪. মূলধন বাজেট বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলো বর্ণনা করো।

২. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করো।

৩. সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটির ওপর আয়কর ধার্য হয়?

ক. ব্যক্তির আয়ের ওপর
খ. আমদানিকৃত দ্রব্যের আয়ের উপর
গ. যানবাহন থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর
ঘ. ভূমি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর

২.

চিত্র : A   চিত্র : B   চিত্র : C   চিত্র : D

কোনটিতে কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ রয়েছে?

ক. চিত্র : A খ. চিত্র : B

গ. চিত্র : C ঘ. চিত্র : D

নিচের সারণিটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি আর্থিক বছরে দুটি দেশের সরকারের গৃহীত বাজেট:-

দেশ-A		দেশ-B	
প্রত্যাশিত আয় (টাকা)	প্রত্যাশিত ব্যয় (টাকা)	প্রত্যাশিত আয় (ডলার)	প্রত্যাশিত ব্যয় (ডলার)
১০০০ কোটি	১১০০ কোটি	২০ লাখ বিলিয়ন	২০ লাখ বিলিয়ন

৩. B দেশের বাজেটকে কোন প্রকারের বাজেট বলে?

ক. সুষম খ. অসম

গ. ঘাটতি ঘ. উদ্বৃত্ত

৪. A দেশের মতো বাজেট প্রণয়নের ফলে

i. প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে

ii. জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে

iii. দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইসরাত একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কেনাকাটা করতে যায়। সে কেনাকাটা শেষে দাম পরিশোধ করে তাকে প্রকৃত দামের সাথে কিছু অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "এটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করা হয়।"

ক. ভূমি উন্নয়ন কর কাকে বলে?

খ. সম্পূরক শুল্ক কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. ইসরাতের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি রাজস্বের কোন উৎসের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাষ্ট্রীয় শিল্পের লভ্যাংশের সাথে ইসরাত প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

২. জাহিদ একটি সরকারি স্কুলে পড়ে। তাদের স্কুলের সবাই খুশি। কারণ এ বছর একটি নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। সে জানতে পারে, সরকার এবার তাদের স্কুলে বড় বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাদের বেতনের মতো এটিও সরকারের এক ধরনের ব্যয়, যা বাজেটের মাধ্যমেই সরকার প্রদান করে।

ক. বাজেটের সংজ্ঞা দাও।

খ. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

গ. জাহিদের স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজটি সরকারের কোন বাজেটের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জাহিদের স্কুলের মতো বাজেট দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। বিশ্লেষণ করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : অর্থনীতি

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।